মুজাদ্দিদ-ই আলফেসানীর

সংস্কার আন্দোলন

মোহাম্মদ রুহুল আমীন

মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন

মোহাম্মদ রুহুল আমীন

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পনর শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন
মোহাম্মদ রুহুল আমীন

ই : ফা: প্রকাশনা : ৫০১
ই: ফা: গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর : ১৯৮৪
আশ্বিন : ৯৩৯১
মহররম : ১৪০৪

প্রকাশক :
অধ্যাপক আবদুল গফুর
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-২।

মুদ্রক :
কে, এ, অদুদ
বাংলা উন্নয়ন প্রেস
১৭, কৈলাশ ঘোষ লেন, ঢাকা-১।

বাঁধাইকার :
বি. জে. বুক বাইন্ডিং হাউস
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১

মূল্য : বাইশ টাকা

MUJADDID-E-ALFESANIR SONGSKAR ANDOLON :

The Reform Movement of Muzaddeed-E-Alfesani. written by Muhmmad. Ruhul Amin and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century AL-Hijrah.

October 1984

Price : 22·00 ; U. S. Dollar : 2·00

আমাদের কথা

উপ-মহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী হযরত আহমদ সিরহিন্দী রহমতুল্লাহ্ আলাইহের নাম ভাস্বর হয়ে আছে ষোলো ও সতের শতকে তদানীন্তন মুসলিম নামধারী বাদশাহ্দের দৌরাত্ম্যে ইসলামী আদর্শ সম্বন্ধে যখন চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল, তখন এই মর্দে মুজাহিদ সিংহের মত গর্জে উঠেছিলেন। ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলতে যেয়ে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধচরণ করতে গিয়ে তিনি হাসিমুখে জেল-জুলুমও বরণ করেন। প্রধানতঃ মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর প্রচেষ্টার ফলেই, আকবরের "দীন-ই-এলাহি" ফেত্না সেদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ইসলামের শাশ্বত আদর্শের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা জোরদার হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর এহেন বৈপ্লবিক আন্দোলনের কোন সুলিখিত ইতিহাস বাংলা-ভাষায় আজও পাওয়া যায় না। বর্তমান লেখক এই গ্রন্থে মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলনের সামাজিক পটভূমির বিশ্লেষণ দান করে তাঁর আন্দোলনের আনুপূর্বিক গতিধারা যেভাবে বিবৃত করেছেন, তাতে পাঠকদের পক্ষে এই আন্দোলন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া সহজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহ্ পাক আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন,
বাংলাদেশ ।। ১৫-১০-৮৪ ইং।

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

লেখকের কথা

উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের এক নিদারুণ সংকটময় মুহূর্তে ও চরম বিপর্যয়কালেই মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রঃ)-এর আবির্ভাব। আলেম সমাজের অধিকাংশই যখন ছিলেন রাজা-বাদশাহদের বৃত্তিভোগী ও তাঁদের মনোরঞ্জনে লিপ্ত; কুরআন-হাদীসকে উপেক্ষা করে গ্রীক-দর্শন ও কালামশাস্ত্র অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় মগ্ন; বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছেড়ে ক্ষুদ্র ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে দলাদলি ও ফেরকাবন্দীতে রত; জাতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ উদাসীন; ইসলামের আসল তাসাউফ যখন প্রাচ্যের বাতিল মতবাদের সংমিশ্রণে এক অভিনব রূপধারণ করেছিল, রাজা-বাদশাহরা যখন ভোগ, সম্ভোগ, যৌন-তৃপ্তি ও বিলাস-ব্যসনে ছিলেন মত্ত; গোটাজাতি যখন ছিল ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ থেকে লক্ষ যোজন দূরে, ছিল গাফলতের আবর্তে ও গোমরাহীর পঙ্কে নিমজ্জিত, ইসলামের উপর দিয়ে বিদাতের বন্যা যখন বয়ে যাচ্ছিল; সর্বোপরি সম্রাট আকবর সৃষ্ট মহা ফিত্না যখন সারা মুসলিম-ভারতব্যাপী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল; মুসলমানদের জাতীয় জীবনকে তা দুর্বিষহ ও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, জাতির প্রাণশক্তি ও জিহাদী প্রেরণা যখন লুপ্তপ্রায়,—জাতি হাজার বছরের এক ঘুনে-ধরা সিন্দুকের পূতিগন্ধময় আবর্জনা স্তূপের মধ্যে ছিল আবদ্ধ; সামনে ছিল তাঁর গাঢ় অমানিশা ও বিভীষিকার রাজত্ব, কন্ঠে ছিল তার মর্মন্তুদ আর্তনাদ; একজন যুগ-প্রবর্তক ও সংস্কারকের আগমন যখন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল, জাতীয় জীবনের সার্বিক পরিস্থিতি যখন একজন মুজাদ্দিদের প্রতীক্ষা করছিল, ঠিক এমনি এক দুর্যোগময় সন্ধিক্ষণে মুক্তির আলোকবর্তিকা হাতে

নিয়ে আবিভূ'ত হলেন শায়খ আহমদ সারহিন্দীর হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুসলিম সমাজের সংস্কারক রূপে। তাইতো তিনি মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী হিসেবে অভিহিত ও পরিচিত।

মুজাদ্দিদ সাহেবের একহাতে ছিল সত্যের অসি, অন্যহাতে মসি এবং কন্ঠে ছিল সত্যের মহাবাণী। অমিত তেজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন সত্যের সংগ্রাম ক্ষেত্রে; দারুণ চাঞ্চল্যের সূচনা করেন মুসলিম ভারতের ভাবে ও কর্মে; সংস্কার করেন মুসলমানদের ব্যষ্টি ও সামষ্টিক জীবন; আলোড়িত করেন তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন; ফুটিয়ে তোলেন ইসলামের সত্য-সুন্দর রূপটি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। বাংলা ভাষায় মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর যথার্থ জীবনী আজো রচিত হয়নি। লিখিত হয়নি তাঁর সংগ্রামী জীবন, সংস্কার আন্দোলন, এর গতিধারা এবং আকবরী ফিত্‌নার মোকাবিলায় তাঁর মহান বিপ্লবী ভূমিকার সঠিক তথ্য সম্বলিত কোন গ্রন্থ। তাই তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ আজ প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। আমাদের সমাজে আজও তিনি শুধু একজন সুফী, পীর ও আধ্যাত্মিক গুরু রূপেই পরিচিত। অথচ তিনি ছিলেন মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের একজন সংস্কারক। তাঁর সংগ্রাম ছিল যাবতীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে—শোষণ-নিপীড়ন ও যুলুমের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন যেমন ছিল ব্যাপক—তেমনি ছিল সর্বতোমুখী।

সব দিক দিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ আজ দিগভ্রান্ত। মুজাদ্দিদ সাহেবের সমকালীন বিপর্যস্ত অবস্থা আজ মুসলিম বাংলার ব্যক্তিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনেও বিরাজিত। এজন্য তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সেই সফল সংস্কার আন্দোলনের ব্যাপক

আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আজ সমধিক। গ্রন্থটি এই অনুভূতিরই বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র।

বাংলাদেশের মুসলমান মাত্রই মুজাদ্দিদ সাহেবের ভক্ত অনুরক্ত। তাঁদের হাতেই বইটি তুলে দিলাম। দেশের এই আদর্শিক বিপর্যয়কালে পাঠকবর্গ উপকৃত হলেই আমার শ্রমকে সার্থক বলে মনে করবো।

যেসব মনীষীর গ্রন্থ ও নিবন্ধ থেকে বইটির রচনায় যাবতীয় মাল-মসলা সংগ্রহ করেছি এবং যাঁদের থেকে পেয়েছি লেখার উৎসাহ তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুকরিয়া। বন্ধুবর মাহবুবুল হকের নিকট আমি বিশেষ কারণে ঋণী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বইটি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। সবার যথার্থ পাওনা রাব্বুল আলামীনই দেবেন।

বইটিতে ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। সঠিক তথ্যভিত্তিক সংশোধিনী দরাজ হস্তে গ্রহণীয়। আল্লাহ্ আমাদের সাধনা কবুল করুন! আমীন!!

মোহাম্মদ রুহুল আমীন

সূচীপত্র

ইসলামের রক্ষা ব্যবস্থা/১
আহমদ সারহিন্দীর জন্ম/৭
আন্দোলনের পূর্বাবস্থা/১০
সম্রাট জাহাঙ্গীর/৭০
কাফেরী ফতোয়া ও গ্রেফতারী/১১৬
জিন্দানখানা থেকে নজরবন্দে/১২৯
আন্দোলনের সফলতা/১৩৫
বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়/১৪০
ব্যর্থ হ'লো হিন্দু মুসলিম 'এজজাত' আন্দোলন/১৪১
ইন্তেকাল/১৪৪
খাজা সাহেবের শিক্ষা/১৪৫
হজরত শাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া (রাঃ)/১৫৫

মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর
সংস্কার আন্দোলন

ইসলামের রক্ষা ব্যবস্থা

মানব সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ্ তাদের হেদায়েতের জন্যে জীবনের আদর্শ স্বরূপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ইসলামকে। এজন্যে যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবীগণকে। তাঁরা মানুষদের দেখিয়ে দিয়েছেন কোন্‌টা সরল, সহজ, সঠিক ও নির্ভুল পথ, আর কোন্‌টা ভ্রান্ত পথ, ধ্বংসের পথ। মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যে নবীদের আবির্ভাবের এই ধারা জারী থাকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত। তিনি সর্বশেষ নবী ও রসুল। তারপর আর কোন নবী আসেন নি। আসার প্রয়োজনও নেই। কাজেই আসবেনও না। কারণ, ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর হাতেই। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করে তিনি এই পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, ইসলামকে দুনিয়ার বুকে কায়েম করে যান। মানব-জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সংশোধন, পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস ক'রে তিনি একটি ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশেষে বিদায় খুতবায় ঘোষণা করেন, "আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে থাকো, তা হলে কখনো গোমরাহ্ ও বিভ্রান্ত হবে না,--আর তা হচ্ছে আল্ কুরআন ও সুন্নাহ্। ভাষণ শেষে নাজিল হলো পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ আয়াত,--

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ـ

"আজ আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর দ্বীন (জীবন-বিধান) হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম।"

যে বস্তু পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তাতে বাইরের কোন বস্তুর সামান্য মাত্র স্থান কখনো হতে পারে না। হলে সে বস্তু পূর্ণ নয়, অপূর্ণ। ইসলামও একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলের হাদীসে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ, কিংবা আমল ও আকীদা ছাড়া অন্য কোন উদ্ভাবিত বিষয়ের স্থান ইসলামে নেই। কুরআন সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন কিছু ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট হলে, কিংবা করানো হলে তা হবে সম্পূর্ণ বেদআত--স্থান বিশেষে শিরক এবং কুফরও।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একসময় রসূল (সঃ) সমবেত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন,--'মুসলমানদের উপর অতঃপর একটা ঘোর বিপদ, একটা ভয়ঙ্কর পরীক্ষা উপস্থিত হবে।" হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি আরজ করলাম,--'হে রসূল! সে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?' রসূল (সঃ) বললেন, উপায় আল্লাহ্‌র কিতাব। অতীতের সব বার্তা, ভবিষ্যতের সকল পয়গাম এবং বর্তমানের সমস্ত করণীয় কর্তব্য এই কিতাবে নিহিত রয়েছে। এই কিতাব হচ্ছে দুনিয়ার সকল সমস্যার সার্থক সমাধান। সাবধান! একে পরিত্যাগ করলে অবিলম্বে তোমাদের টুক্‌রো টুক্‌রো করে উড়িয়ে দেওয়া হবে। একে ছেড়ে পথের সন্ধান করতে গেলেই তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' এই কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় রজ্জু, তার প্রেরিত জ্ঞানময় শিক্ষা এবং তার নির্ধারিত সহজ সরল মুক্তি-পথ। তাছাড়া এই কিতাবের বিশেষত্ব হল এই--

لا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه -

--"জ্ঞানবান সমাজ যতই তার অনুশীলন করবেন, তাঁদের জ্ঞান পিপাসা ততই বেড়ে যাবে, সে জ্ঞান বা জ্ঞান-পিপাসার পরিসমাপ্তি হবে না। পুনঃ পুনঃ ব্যবহার সত্ত্বেও তা কখনও পুরনো বা অব্যবহার্য হয়ে পড়বে না। তার অভিনবত্ব কখনই শেষ হয়ে যাবে না। (দারমী ও তিরমিজী—মর্মানুবাদ)

এই হাদীস থেকে কুরআন ও ইসলামের স্বরূপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেদীপ্যমান হয়ে গেছে। ইসলামকে জানতে হলে এই কুরআনেরই আশ্রয় নিতে হবে। আল্লাহ্‌র শাশ্বত বাণী এই কিতাব আল্-কুরআন। এটি সকল যুগের, সব দেশের, সমস্ত মানুষের জন্যে সম্যকভাবে উপযোগী, সমানভাবে কার্যকরী। এটি এক চিরস্থায়ী, অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। সব সমস্যার সমাধান ও সর্বোত্তম জীবন-বিধান এটি। রসূল (সঃ) এর চরিত্র হলো এই কুরআন (خ لقه القـرآن العـظـم) এই কুরআন আর তার জীবন্ত প্রতীক রসূল (সঃ)-এর জীবন প্রবাহই হলো আসল ইসলাম। অর্থাৎ কুরআন আর সুন্নাহ্ এ দু'টোই হলো ইসলামের মূল। এই মূলের সঙ্গে যতদিন ইসলামের সংযোগ থাকবে এখান থেকেই সব রস সঞ্চিত হবে—ততদিনই ইসলাম নবী প্রচারিত ইসলাম হয়ে থাকবে। মূলের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেলেই ইসলাম আর সত্যিকার ইসলাম থাকবে না। তখন ইসলামরূপ বৃক্ষটি জীর্ণ-শীর্ণ ও শুষ্ক কাষ্ঠে পরিণত হয়ে যাবে। একটি বৃক্ষ তা যত বিরাটই হোক, মূলের সাথে তাকে সংযোগ বজায় রাখতেই হবে, তাহলেই সে মূল থেকে রস টেনে নিতে এবং অপর দিকে উর্ধবাকাশ থেকে দেহের উপযোগী খাদ্যও (নাইট্রোজেন) গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। তবে যা তার দেহের পক্ষে ক্ষতিকর (অক্সিজেন) তা কখনো সে গ্রহণ করবে না। এভাবেই একটি গাছ বেঁচে থাকে এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত একটি পূর্ণ-বৃক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু মূলের সাথে সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেলে, উর্ধবাকাশ থেকে যত খাদ্যই সে গ্রহণ করুক না কেন তার মৃত্যু অনিবার্য। ইসলামরূপ বৃক্ষটির অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। তাই মূলের সাথেই থাকবে তার সংযোগ। এই সংযোগ রক্ষা করে সে চলবে। এই মূল থেকেই সে রস আহরণ করবে। জাতিকে দেবে পথের দিশা। বিশ্বকে দেবে আলোর সন্ধান। তবে হাঁ, বিশ্বের অন্যান্য মতবাদ থেকেও প্রয়োজনবোধে কিছু গ্রহণ করতে পারে সে। গ্রহণ করবে সে তা-ই যা তার দেহের পরিপুষ্টির প্রয়োজন, পরিপুষ্টি বিধানে সক্ষম। যেমন গ্রহণ করে থাকে আকাশ থেকে একটি বৃক্ষ।

মুসলমানদের আদর্শ হলো এই ইসলাম। তাদের ব্যক্তিক, সামষ্টিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাবধারা এবং কার্যক্রম এই আদর্শের উপরই নির্ভর-

শীল। যতদিন তারা এই আদর্শের উপর কায়েম থাকবে ততদিনই দুনিয়ায় তারা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবে। বিশ্বের নেতৃত্ব তারাই দেবে, কর্তৃত্ব তারাই করবে। কিন্তু এই ভিত্তি থেকে নড়ে গেলে, তার সাথে সংযোগহীন হয়ে পড়লে তারা আর জীবন্ত জাতি থাকবে না। মূলের সাথে সংযোগহীন শুষ্ক বৃক্ষটির ন্যায় অন্য জাতির জ্বালানী-কাষ্ঠে পরিণত হবে। বিশ্বে তারা একটি নিকৃষ্ট, নিপীড়িত, নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত জাতি হয়ে দাঁড়াবে। জ্বালানী কাষ্ঠের ন্যায় অন্যের কাজে, অন্যের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হবে নিজে। নিজের জাতির কোন কাজে আসবে না। এমনকি কুড়ালের ডাট হয়ে স্বজাতির ধ্বংস সাধনই করবে।

এটা শুধু তাত্ত্বিক কথাই নয়। এই আদর্শের সাথে সুদৃঢ় সংযোগ রক্ষার কারণেই একদিন তারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল, হাজার বছরব্যাপী দিয়েছিল বিশ্বের নেতৃত্ব। আজ আর এই আদর্শচ্যুত হয়েই তারা পতিত লাঞ্ছিত।

আদর্শ এবং ব্যক্তি অভিন্ন নয়, বিভিন্ন। আদর্শ হচ্ছে তত্ত্ব আর ব্যক্তি বাস্তব। ব্যক্তিকে দিয়ে সব সময় তার আদর্শের বিচার চলে না। তাই ব্যক্তির বিচার ব্যক্তিকে দিয়ে এবং আদর্শের বিচার আদর্শকে দিয়ে করতে হয়। কারণ ব্যক্তি, সঠিকভাবে তার আদর্শ অনুসরণ না করলে কিংবা বিকৃতরূপে তা গ্রহণ করলে আদর্শের সঠিক রূপের অভিব্যক্তি ঘটে এবং এর কল্যাণময়তা প্রকাশ পায় না। ইসলামী আদর্শের ক্ষেত্রে এটি আরো বেশী করে প্রযোজ্য।

সাধারণত প্রবৃত্তির তাড়নায়, দেশাচার ও রাষ্ট্রিক চাপে, পারিপার্শিকতার প্রভাবে এবং অজ্ঞতা ও পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণের কারণে আদর্শের দাবীদার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাধারা বিকৃত ও বিপথগামী হয়ে যায়, তাদের চাল-চলন আদর্শ বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কারণে ধ্বংস হয় আদর্শ। পতন ঘটে জাতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও। অতীতের বহু সভ্যতা সংস্কৃতির, বহু আদর্শ ও জাতির পতন হয়েছে এমনিতেই।

ইসলামও একটি আদর্শ। সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ। মুসলিম জাতি এর অনুসারী। এখানেও সেই একই ভয়—একই আশঙ্কা বিদ্যমান

ছিল। এবং ছিল বলেই মহান আল্লাহ্ এর হেফাজতের সুব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) বলছেন,—

لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق
لا يضرهم من خذلهم حتى ياتى امر الله (صحاح)

অর্থাৎ "আমার উম্মতের মধ্যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠাবান একটি দল সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত সমসাময়িক লোকদেরকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ডাক দিয়েই যাবে।"

রসুল (সঃ) আরো জানাচ্ছেন,—

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد
لها دينها ابوداؤد - بيهقى و غيره

অর্থাৎ "আল্লাহ্ এই উম্মতের জন্যে প্রতি শতাব্দীর অবসানকালে এমন একজন ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি উম্মতের স্বার্থে তাঁর দ্বীনের সংস্কার সাধন করবেন।"

এখন বোঝা দরকার, মুজাদ্দিদ কে? তাঁর বৈশিষ্ট্য কি তিনি এমন কি কাজ করবেন, যদ্দরুণ তিনি শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকর্তারূপে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য হবেন? এর জবাব অত্যন্ত ব্যাপক। সংক্ষেপে বলা যায়--মুজাদ্দিদ কোন দাবী করার জিনিস নয়--করে দেখানোর জিনিস। শতাব্দীব্যাপী যেসব কুসংস্কার ও অনাচারে ইসলামের সত্য সুন্দর রূপটি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, যে মহামনীষী তাঁর অনুপম পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় শাস্ত্র-জ্ঞান, বিপুল কর্মশক্তি, দুর্জয় সাহস, তেজোদ্দীপ্ত কন্ঠ এবং ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে যেসব জঞ্জাল ও আবর্জনা মুক্ত করবেন, ইসলামের সত্য সুন্দর রূপটির বিকাশ ঘটাবেন এবং যুগের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সক্ষম হবেন,--মুজাদ্দিদ তিনিই। তার কর্মসীমা মাদ্রাসা কিংবা খানকাহ্‌র চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, তাঁর সময় কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীতেই কাটবে না কিংবা মুরাকাবা-মুশাহাদাতেই ব্যয়িত হবে না। বরং তাঁর কাজের ধরণই হবে ভিন্নতর। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) বলছেন,--

বিপ্লবী কর্মধারার মাধ্যমে এই রক্ত-ধারারই পরিচয় দিয়েছিলেন।

পবিত্র কুরআন হিফ্‌জ করার পর তিনি অধিকাংশ পাঠোপযোগী কিতাব পিতার কাছেই অধ্যয়ন করেন। এছাড়া তিনি সরহিন্দের অন্যান্য বিশিষ্ট আলেমগণের নিকটও শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনের পর মুজাদ্দিদ সাহেব পিতার নিকট আধ্যাত্মিকতার সবক নেন। সৌভাগ্যবশত তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম পীরে কামেল হযরত বাকীবিল্লাহ্ (রঃ)-এর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর হাতেও বাইয়াত হন। তিনি সমসাময়িক আরো বহু জ্ঞানীগুণী ও বুজুর্গ লোক-দেরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং অধ্যাত্ম তত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। শরীয়ত ও মারেফত সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর মুজাদ্দিদ সাহেব অধ্যাপনার প্রতি মনোযোগী হন। কিছুকাল অধ্যাপনাও করেন। কিন্তু তাঁর আসল কাজ তখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে, যে জন্যে তাঁর আবির্ভাব। আর তা ছিল দ্বীনের সংস্কার সাধনের কাজ। এসময় সারা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের মশাল নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। মুসলিম নামধারী বাদশা ইসলামের ধ্বংস সাধনে ছিলেন লিপ্ত। পাত্র-মিত্র এমনকি দরবারী আলেমগণ পর্যন্ত আপন আপন স্বার্থ উদ্ধারে ছিলেন ব্যস্ত। অজ্ঞতা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে সারাদেশ ছিল আচ্ছন্ন। এ ছিল ইসলামের এক ঘোর দুর্দিন। কিন্তু সদিকে কারো লক্ষ্য ছিল না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে মগ্ন। যুগের শ্রেষ্ঠতম আলেম এবং পীর সাহেবানরাও এদিকে কেউ নজর দেননি, দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি কিংবা সাহসী হননি। মাদ্রাসার পরি-সীমা এবং খানকাহ্‌র চারপাশের মধ্যে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, জ্ঞানানুশীলন, গ্রন্থ রচনা এবং পীরি-মুরীদী পর্যন্তই তাঁদের কর্মধারা সীমিত ছিল। তারা এটাকেই নিজের ঈমান রক্ষার জন্যে যথেষ্ট মনে করেছিলেন, ইসলামের হেফাজতের উপায় ভেবেছিলেন।—তাই বাইরের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌ এই কঠিন কাজের কঠোর দায়িত্ব অর্পণ করলেন তেজদৃপ্ত কণ্ঠ, স্বর্ণপ্রসু লেখনী এবং দুর্দমনীয় সাহসের অধিকারী সরহিন্দের শেখ আহমদ (রঃ)-এর উপরই।

আহমদ সরহিন্দীর সংস্কার আন্দোলনের বর্ণনা দানের পূর্বে পাক-ভারতের তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দুশমনদের ইসলাম-বিরোধিতা এবং মুসলমানদের ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয় সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ অপরিহার্য।

আন্দোলনের পূর্বাবস্থা

আকবরী ফিত্না

আকবরের জন্ম ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে। তিনি রাজত্ব করেন ১৫৫৬ খ্রীঃ থেকে ১৬০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত। আহমদ সারহিন্দীর জন্মের সময় (১৫৬৩—১৬২৪ খ্রীঃ) আকবরের রাজত্বের পূর্ণ যৌবন। আর তিনি যখন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন,—তখন ছিল আকবরশাহীর চূড়ান্ত উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শান-শওকতের কাল। আর এই সময়েই আকবরী ফিত্নার ভয়াবহতাও চরম আকার ধারণ করে।

ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানব জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই—যার সমাধান ইসলাম দেয় নি। মানুষের ব্যক্তিগত' সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক—প্রত্যেক দিকের প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। মানব জীবনের কোন দিককে বাদ দিলে কোন মতবাদই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না ইসলাম ছাড়া অনুরূপ কোন মতবাদই দুনিয়াতে না জন্ম নিয়েছে, না আছে। ইসলামে রাজনীতি ও ধর্ম অভিন্ন। এর একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করলে ইসলাম আর সত্যিকার ইসলাম থাকবে না। করলে তা হবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান প্রভৃতি ধর্মের ন্যায় একটি আনুষ্ঠানিক ধর্ম। আর মুসলমানদের রাজনীতি পরিণত হবে মেকিয়াভেলীর ধোঁকাবাজির রাজনীতিতে। তাদের সমরনীতি রূপ নেবে চেঙ্গিস খাঁর হলাহল রণনীতিতে। তাদের অর্থনীতি হবে শোষণের হাতিয়ার কিংবা পেষনের স্টীমরোলার। ইসলাম আর বিশ্বনবীর সেই ইসলাম থাকবে না।

পানি ও চিনি দিয়ে তৈরী হয় শরবত। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শরবতের উপাদান পানি ও চিনিকে পৃথক করা হলে তা আর শরবত থাকবে না। এক অংশের নাম হবে শুধু পানি, অপর অংশে থাকবে

শুধু চিনি। এজন্যেই মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) বলেছেন, রাজনীতিকে ধর্ম হইতে পৃথকরূপে ভাবিলে চলিবে না, রাজনীতিকে ধর্মের অঙ্গীভূত স্বীকার করিতে হইবে।'[১২]

ইসলামী রাজনীতির মূল কথাই হলো—আল্লাহ্‌র যমিনে তাঁরই প্রভুত্ব কায়েম থাকবে। সারে জাহানের একমাত্র মালিক তিনি, তাতে হুকুমত চলবে তাঁরই। রাজ্য যার রাজত্বও চলবে তাঁর। আর মানুষ মাথা নত করবে শুধু আল্লাহ্‌র সামনে। কোন ব্যক্তিক, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সামনে নয়। মানুষ তার ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌রই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে, মেনে চলবে একমাত্র তাঁরই আদেশ নিষেধ। আল্লাহ্‌কে কেবল মস্‌জিদ মন্দির আর গীর্জায়ই মানবে না. বরং সমগ্র জীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে তাঁরই বিধান মতে। এই ছিল সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত, জগতের সকল ফিরাউন, সাদ্দাদ, নমরুদদের সাথে এই দাওয়াত ও তার নিশানবাহীদের সংঘাতের মূল কারণ এখানেই। যিনি যখনই এই দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, যুগের ফিরাউনরা তখনই তাঁকে অপরাধী ও বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছে। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের উপর চালিয়েছে চরম নির্যাতন। কারণ, এরা কায়েমী স্বার্থবাদী। স্বার্থে আঘাত লাগে বলেই এই দাওয়াতকে তারা সহ্য করতে পারেনা। এই সংঘর্ষ ও সংঘাত যেমন আল্লাহ্‌র নবীদের সাথে হয়েছে তেমনী নবীর পথ ধরে যাঁরাই এ কাজে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সাথেও হয়েছে। সত্য ও মিথ্যা; ন্যায় ও অন্যায় এবং হক ও বাতিলের এই সংঘাত চিরন্তন। এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি ট্রেনে করে নির্দিষ্ট কোথাও গেলে, যাওয়ার পথে তার সামনে যে যে স্টেশন পড়েছে, অপর কেউ যদি একই পথে সেই স্থানে পৌঁছুতে চায়, এর সামনেও সে সে স্টেশন অবশ্যই আসবে। এর ব্যতিক্রম হলেই বুঝতে হবে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম জনের পথে যাচ্ছে না। অন্য পথেই চলছে। বিশ্বনবী আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছেছেন যে পথে এবং এ ব্যাপারে যে যে স্টেশন পড়েছে তাঁর সামনে—অর্থাৎ সেই তায়েফ, বদর ওহুদের ময়দান—বিশ্বনবীর ইসলাম নিয়ে যাঁরাই সে পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের সামনে পড়বে সেই ধরনের সংঘাতময় স্টেশনগুলো। এ

যুগেও তা পড়বে ভবিষ্যতেও পড়তে থাকবে।

তবে কেউ যদি পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন না মানে এবং ইসলামের বিশেষ কোন অংশকে নিয়ে কাজ শুরু করে তবে তার সাথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে আঘাত না লাগার কারণে সংঘাত নাও হতে পারে। আমাদের কথা চলছে পুরো ইসলামকে নিয়ে যেসব মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদ সংস্কারমূলক কাজ করেছেন—তাঁদের সম্বন্ধে। তাঁদের সাথে এই সংখাত অনিবার্য। সুতরাং মুজাদ্দিদে আলফেসানীর সঙ্গে স্বভাবতই এই সংঘাত হয়েছে। এই সংঘাত সম্পর্কে বর্ণনা দানের পূর্বে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা দরকার।

সম্রাট আকবরের রাজনীতি

সম্রাট হুমায়ুন যখন শেরশাহ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন, সিন্ধুর মরুভূমিতে অমরকোট নামক স্থানে ১৫৪২ খ্রীঃ সম্রাট আকবর জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর ৪ মাস। তাঁর অভিভাবক হিসেবে বৈরাম খাঁ সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এর পর আকবর স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এসময় তাঁর রাজনীতি তিনটি বিরাট শক্তির সম্মুখীন হয়েছিল।

ক। পাঠান—এদের কাছে পরাজিত হয়ে সম্রাট আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ুন ভারত থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাদের মুকাবিলায় আকবরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হতো।

খ। শিয়া সম্প্রদায়—এদের কেন্দ্র ছিল ইরান। এদেরই সহযোগিতায় হুমায়ুন দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। সুতরাং দিল্লীর ওপর তাদের একটা দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গ। হিন্দুশক্তি—এ সময় মোগল সাম্রাজ্যে শতকরা ৯৫ জন ছিল হিন্দু অধিবাসী। দিল্লীর পূর্ববর্তী বাদশাহদের প্রবল প্রতাপ ও শক্তির দাপটে হিন্দুরা ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্য সংগ্রামের সাহসই তারা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে তারা চানক্য বুদ্ধির দ্বারা কাজ করছিল।

আকবর এই ত্রিশক্তির চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এবং এজন্য ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি ভাবলেন, এই অবস্থায় নিজের ধর্মের উপর অটল থাকার অর্থ হবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করা। প্রধান শত্রু পাঠানরা তো সুযোগের অপেক্ষায়ই আছে। হিন্দু এবং তাদের দমন করা অপরিহার্য। আকবর অনুভব করলেন, এই পরিস্থিতিতে হিন্দু শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা ও তাদের মনস্তুষ্টি বিধানই একমাত্র পন্থা ও বুদ্ধির কাজ। তাই তিনি রাজনীতিকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দিলেন এবং ইসলাম বিরোধিতায় ও ভিন্ন ধর্মীদের মন যোগানোতেই মশগুল হলেন।

আকবর তাঁর এই ভাবধারা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের পালা শুরু করেন। তিনি দরবারে প্রত্যেক ধর্মের পণ্ডিত পুরোহিতদের সভা ডাকতেন। তাদের বিতর্ক শুনতেন। এটা ছিল তাঁর রাজনীতি। উদ্দেশ্য, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই যেন তাঁকে আপন ভাবে। যদি ধর্ম সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকতো, তবে এই সুযোগে তিনি তাদের সামনে ইসলামী হুকুমতের নকশা পেশ করে দিতেন। তা না হলে অন্তত অধর্মাচারী হতেন না কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। স্বীয় দস্তখতটা পর্যন্ত করতে জানতেন না। তাই সংশোধন, পরিমার্জন ও শান্তির পথ ছেড়ে তিনি ফাসাদ ও অশান্তির পথই বেছে নিলেন এবং একটি নতুন ধর্মের প্রচার শুরু করে দিলেন। আর খোদাদ্রোহিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মেরই নাম রাখলেন 'দ্বীনে ইলাহী'।

দ্বীনে ইলাহীর বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে আমরা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "মুন্তাখাবুত্ তাওয়ারীখ"-কেই প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করবো, সেখান থেকেই এ সম্পর্কে উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। কেননা, মোল্লা বদায়ুনী আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি আকবরের নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। সবকিছু স্বচক্ষে দেখেছেন, সবকিছু সত্য সত্য লিখেছেন বলে আল্লাহ্‌কে স্বাক্ষী রেখে কসমও করেছেন।

দ্বীনে ইলাহীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোল্লা বদায়ুনী লিখছেন,

"আকবর দৈনিক চার বার অর্থাৎ প্রত্যুষে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও মধ্য রাতে সূর্যের উপাসনা করতেন এবং সূর্যের এক হাজার একটি হিন্দী নাম জপতেন। দৈনিক অনুরূপ চার বার সূর্যের উপাসনা করা তিনি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলেন। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ওসব নাম জপ করতেন। আপন কর্ণদ্বয় ধরে একটি চক্কর খেতেন এবং কানের লতিতে কিল মারতেন। কর্ণচ্ছেদ করে তাতে বালি লাগাতেন। এ ধরনের অন্যান্য ক্রিয়াকর্মও করতেন। প্রতিদিন মধ্যরাতে ও সূর্যোদয়ের সময় নহবত এবং নাকাড়াও বাজাতেন।

আকবর সূর্যের নামের বন্দনাকালে সূর্যকে লক্ষ্য করে বলতেন- জাল্লাত কুদরাতুহু' অর্থাৎ তার শক্তি মহিমাময়, (নাউজবিল্লাহ)

"অনুরূপভাবে আকবর অগ্নি, পানি, বৃক্ষ, সমস্ত উপকারী জীব, এমনকি গরু ও গরুর মলের পর্যন্ত পূজা করতেন এবং গায়ে চন্দনা কপালে তিলক ও গলায় পৈতা লাগিয়ে দেহ সাজাতেন। সূর্যোদয়ের সময় যোগসাধনে বসে মন্ত্র পাঠ করতেন। এই মন্ত্র তাঁকে হিন্দুর শিখিয়েছিল। [৪]

তিনি শুধু সূর্যের উপাসনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং প্রতিপালক প্রভুর মর্যাদাও তাকে দিয়েছিলেন। আকবরের মতে—
"সূর্য সমগ্র বিশ্ব-উজ্জীবনকারী। সারা বিশ্বকে সে সব কিছু দান করে থাকে। বাদশাগণের অভিভাবক। বাদশাগণ তার ছায়া ও বিকাশ মাত্র।" [৫]

বাদশা আকাশের নক্ষত্ররাজির উপাসনাও করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর থেকে চরম বাড়াবাড়ি প্রকাশ পায়। এমনকি,—

"বাদশা সাতটি নক্ষত্রের রঙ-এর অনুরূপ পোশাক রাখতেন। যেহেতু (তাঁর মতে) প্রতিটি দিখন কোন একটি নক্ষত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল-

৩. (মুন্তাখাবুত্ তাওয়ারীখ, পৃঃ-৩২২)

৪. পৃষ্ঠায় ঐ পুস্তক পৃষ্ঠা ২৬১,

৫. ঐ, পৃষ্ঠা ২৬১

এজেন্য যেদিনটি যে নক্ষত্রের সাথে সম্পর্কিত, সেদিন তিনি ওই নক্ষত্রের রঙ-এর অনুরূপ পোষাক পরিধান করতেন।[৬]

শুকর সম্বন্ধে হিন্দু পণ্ডিতরা বাদশাকে বুঝিয়েছিলেন যে আল্লাহ্ শুকরের মধ্যে অনুপ্রবিস্ট হয়ে আছেন। (নাউজুবিল্লাহ) সুতরাং শুকর একটি সম্মানীয় প্রাণী। অজ্ঞ আকবর তাদের একথা বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাকে একটি সম্মানীয় জীবের মর্যাদাও দিয়েছিলেন।

হিন্দুধর্মের বিশ্বাসের অঙ্গ জন্মান্তরবাদেও আকবর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং একে তাঁর নব প্রবর্তিত ধর্মের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন হিন্দুদের মতে, প্রত্যেক মানুষ মৃত্যুর পর নিজের পাপ-পূণ্য ক্রিয়া-কর্ম অনুযায়ী পুনরায় শুকর, কুকুর, বিড়াল, সাপ, বিচ্ছু, উচ্চ বর্ণের মানুষ, নিম্ন বর্ণের মানুষ ইত্যাদি রূপে পুনঃ জন্ম নিবে। এভাবেই জন্মের ধারা চলতে চলতে একদিন চরম নির্বাণ লাভ হবে। এটাই হলো 'জন্মান্তরবাদ'। আর "এই জন্মান্তরবাদে আকবরের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল।[৭]

বাঙলার সুবাদার (গভর্ণর) আজম খাঁ বাদশার দরবারে হাজির হলে বাদশাহ তাঁকে বলেন,—

"আমরা জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বলিষ্ঠ যুক্তি পেয়ে গেছি। শেখ আবুল ফজল তা তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।"[৮]

জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বাদশার সন্তোষ ও বিশ্বাস বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণরা এ সম্পর্কে তাঁকে যা বুঝাতেন, তিনি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তা-ই বিশ্বাস করতেন। তাদের পরামর্শক্রমে বাদশাহ্ মাথার শুধু মধ্যখানের চুল কামিয়ে ফেলতেন আর চারপাশের চুল রেখে দিতেন। বিশ্বাস এই ছিল যে, বাদশা আত্মসম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা (নির্বাণ) লাভ করেছে, আর—

"সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আত্মা (রূহ) (মৃত্যু কালে)

৬. ঐ পৃষ্ঠা ২৬১

৭. ঐ পৃষ্ঠা ২৫৮

৮. ঐ পৃঃ ৩০০

মাথার তালু দিয়েই বের হয়ে থাকে। এটা দেহের সুড়ঙগসমূহের মধ্যে দশম সুড়ঙগ। পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আত্মা যে সময় তালু দিয়ে বের হয়, সে সময় বজ্রের ন্যায় একটি বিকট শব্দ হয়। এই শব্দ মৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য এবং পাপসখলন মুক্তিরই চিহ্ন। আর জন্মান্তর বাদ অনুযায়ী একথারই প্রমাণ যে, ওই আত্মা কোন একজন ঐশ্বর্যশালী, ক্ষমতাবান এবং একচ্ছত্র নরপতির দেহে গিয়ে জন্ম নিবে।"

হিন্দুদের মৃত দেহকে দাহ করা হয়ে থাকে। শবদাহের সময় স্বাভাবিকভাবেই মৃত ব্যক্তির মাথার তালু ফেটে একটি আওয়াজ বের হয়। সম্ভবত ব্রাহ্মণেরা এই শব্দকেই মুক্তির একটি যুক্তি ঠাওরিয়েছেন এবং বাদশাহকে তা বুঝিয়েছেন। আর বাদশাহও তা বিশ্বাস করেছেন। এতে আকবরের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি এই শান শওকতের সাথেই অপর একটি সিংহাসনে আসীন হয়ে যাবেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ তাঁকে এতটুকু পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়েছেন যে, যেহেতু আকবরের আমল থেকেই চান্দ্র বছরের স্থলে সৌর বছর গণনার রীতি চালু হয়েছে,—সেহেতু এখন থেকে বাদশাহর আয়ুষ্কাল আর হ্রাস পাবে না। কেননা চাঁদের পরিক্রমনের ফলেই আয়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সুতরাং গণনার ওই রীতি যখন বাদ পড়েছে—তখন আয়ু হ্রাসের আশংকাও উঠে গেছে।

বস্তুতঃ এভাবে প্রথমে তো মৃত্যুকেই সুদূরকাল পর্যন্ত মুলতবী করে দেয়া হয় পরে তাঁর এই বিশ্বাসও জন্মিয়ে দেয়া হয় যে, ভবিষ্যতেও তাঁর আত্মা তাঁরই অনুরূপ অপর একজন বাদশাহর দেহে অনুপ্রবিষ্ট হবে। অর্থাৎ পুনরায় তিনি বাদশা হয়েই জন্মগ্রহণ করবেন। এতে বাদশাহর হতাশা লোপ পায় এবং মৃত্যুভয় চলে যায়।

মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী লিখছেন যে, এক সময় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত' অনুবাদকালে একটি কাহিনী উল্লেখ করতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর লেখনীতে কবিতার একটি চরণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। চরণটির ভাবার্থ হলো—'প্রত্যেক কাজের জন্যই পুরষ্কার ও শাস্তি নির্ধারিত আছে।' এটি শুনে সম্রাট ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। কারণ, বদায়ুনীর এই চরণে—

"কবরে মুন্‌কির-নকিরের সওয়াল জওয়াব, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, মিজান-পুলসিরাত ইত্যাদির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে বাদশা ধারণা করে বসেন। এবং একে তাঁর জন্মান্তরবাদ সম্পর্কিত বিশ্বাসের বিরোধী বলে নির্দেশ করেন। জন্মান্তরবাদ ছাড়া অন্য কিছুতেই তাঁর আস্থা ছিল না।"[৯]

এতে মোল্লা বদায়ুনী পড়লেন ভীষণ বিপদে। তাঁর বাঁচার আর কোন উপায় নেই দেখে পরিশেষে চাতুর্যের সঙ্গে চরণটির অনুবাদ করে তিনি প্রাণ রক্ষা করেন।

এভাবে বিশ্বাসগত ত্রুটি ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরিকী থাকা সত্ত্বেও আকবর তাঁর নব প্রবর্তিত ধর্মের নাম রাখেন "দ্বীন-ই-ইলাহী"।

আকবর নিজেও এই ধর্মে ঈমান আনেন, অন্যদেরকেও এই ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেন। যারা ঈমান আনতো, তাদেরকে তিনি রীতিমত মুরীদ বানাতেন, বাইয়াত করতেন। বাদশাহ তাদেরকে কালেমাও পড়াতেন। নবপ্রবর্তিত ধর্মের কালেমাও ছিল অভিনব। মোল্লা বদায়ুনীর ভাষায়—

"স্থির করে দেওয়া হয় যে, কালেমায়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে "আকবর খলীফাতুল্লাহ্‌ও বলতে হবে।"

"বরং এই কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, কেবলমাত্র মুরীদদের পর্যন্তই ওটা সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং প্রজা সাধারণকেও তা বলার জন্যে আইনগতভাবে বাধ্য করা হতো।[১১]

কোন ব্যক্তি এই নতুন ধর্মে যথারীতি দাখিল হলে তাকে উপরোক্ত কালেমা পাঠের পর আর একটি শপথও গ্রহণ করা হতো। মোল্লা বদায়ুনী এই শপথনামাকে হুবহু নকল করে দিয়েছেন। তা হলো—

---

৯. মুন্তাখাব, পৃঃ-৪০০,

১০. মুহাম্মদ মিয়া ওলামায়ে হিন্দ কা শান্‌দার মাজিয়ে জাদিদ, (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪)

১১. মুন্তাখাব, পৃঃ ২৭৩

"আমি অমুকের ছেলে অমুক। আমি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, ঐকান্তিক বাসনায় ও আন্তরিক আগ্রহেই বাপ-দাদা থেকে চলে আসা এই কৃত্রিম ও অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম ইসলাম বর্জন করছি এবং আকবরশাহী দ্বীন-ই-ইলাহীতে দাখিল হচ্ছি। আর এই ধর্মে চরম নিষ্ঠার পরিচয়বহ চারটি স্তর যথা—জান-বর্জন, মাল-বর্জন, ইজ্জত-বর্জন, ও দ্বীন-বর্জন—এ সবকে মেনে নিচ্ছি।"[১২]

যারা দ্বীন-ই-ইলাহীতে ঈমান আনতো, তাদেরকে যোগী-সন্ন্যাসীদের ন্যায় 'চিল্লা' (চল্লিশ দিবস ব্রত পালন) দিতে হতো। এরা যাদেরকে মুরীদ বানাতো—তারা 'ইলাহী' নামে খ্যাত হতো। তারা পরস্পরের মধ্যে যে সব চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতো—সে-সব পত্রের শিরোনামায় তাদেরকে অবশ্যই "আল্লাহু আকবর" লিখতে হতো। এটা তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। এই "আকবর" দ্বারা সম্রাট আকবরকেই বোঝানো হতো। সালাম দেওয়ার রীতি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ছিল। নতজানু হয়ে সিজদা দিয়ে বাদশাহর প্রতি সম্মান দেখনো হতো। মুরীদদের পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎকালে একজন বলতো—'আল্লাহু আকবর'। এটা 'আল্লাহ্ মহান' এই অর্থে নয়—বর 'সম্রাট' আকবর মহান' এই অর্থেই সে উচ্চারণ করতো। এর প্রত্যুত্তরে বলা হতো 'জাল্লা জালালুহু'। অর্থাৎ সর্বোচ্চ তাঁর মহিমা। আর বাদশা আকবরের প্রকৃত নাম ছিল 'জালাল' অথচ এই বিশেষণ একমাত্র আল্লাহ্র সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

এই ধর্মে মুরীদ করার পদ্ধতি ছিল—"বার ব্যক্তির সমন্বয়ে এক একটি দল হতো। প্রত্যেক দল পর পর এসে বাদশার কাছে দীক্ষা নিত। ধর্মীয় ব্যাপারে এরা সবাই একই পন্থা অনুসরণ করতো।"[১৩]

প্রত্যেক মুরীদকে একটি করে পাগড়ী দেওয়া হতো। তা ছাড়া—

"মুরীদদেরকে বাদশার একটি প্রতিকৃতি দেওয়া হতো। এই প্রতিকৃতিকে নিষ্ঠার চিহ্ন, দৃঢ়তা ও সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা

১২. মুন্তাখাব, পৃঃ ৪৭৩

১৩. ঐ পৃঃ ৩৪১

হতো। হীরা-মানিক খচিত একটি সুন্দর গিলাফে এই প্রতিকৃতি গেঁথে মুরীদরা তা আপন আপন পাগড়ীতে লাগাতো।"

এনসাইক্লোপডিয়া বৃটেনিকায়ি সম্রাট আকবরের এই হাস্যকর ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে—"এই অদ্ভুত ধর্মের নবী ছিলেন সম্রাট আকবর স্বয়ং ···। প্রতিদিন প্রত্যুষে তিনি সমগ্র বিশ্ব উজ্জীবনকারী পরমাত্মার প্রতীকরূপী সূর্যের পূজা করতেন। অপর পক্ষে তিনি নিজে স্বয়ং। অগণিত মূঢ় নরনারী কর্তৃক পূজিত হতেন।"

এই ছিল সম্রাট আকবরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের সর্বোত্তম পন্থা। আকবর কিভাবে মানুষকে তাঁর ভক্তে পরিণত করেছিলেন তারা কিভাবে সম্রাটের প্রতি তাদের ভক্তি নিবেদন করতো—তা আরো চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। এই ভক্তি নিবেদনের পন্থা সম্বন্ধে মোল্লা বদায়ুনী লিখেছেন—

"প্রত্যেকদিন ভোরে যে সময় বাদশা ঝরোকায় (ঝুলন্ত বারান্দায়) সূর্যের উপাসনা করতেন, সে সময় বাদশার মুবারক মুখমণ্ডল দেখার পূর্ব পর্যন্ত এসব মুরীদের পক্ষে দাঁতন করা ও পানাহার করা সম্পূর্ণ হারাম ছিল। প্রত্যেক অভাবী, নিঃস্ব ও ফরিয়াদী হিন্দু হোক বা মুসলমান, পুরুষ হোক অথবা নারী, সুস্থ হোক কিংবা রুগ্ন—প্রত্যেক প্রকারের মানুষের জন্যে এখানে আসার সাধারণ অনুমতি ছিল। যার ফলে প্রতিদিন এখানে একটা হাঙ্গামা হুজুগ ও লোকের হৈচৈ লেগেই থাকতো এবং একটা বিরাট মেলা বসে যেতো। বাদশা সূর্যের এক হাজার এক নাম জপ করে পর্দার বাইরে এসে দর্শন দেওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটি লোক তাঁর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।[১৪]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাদশা নিজে হাজার হাজার দেবতার দাসত্বে বন্দী হয়েছেন ক্ষুদ্র বস্তুটি থেকে সূর্য পর্যন্ত তিনি এমন প্রতিটি বস্তুর পূজা করতেন যার মধ্যে সামান্যতম উপকারের সম্ভাবনা এবং ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান ছিল। আর মুরীদরা এসব দেবতার পূজা তো করতোই তার উপর তাদেরকে স্বয়ং বাদশারও পূজা করতে হতো। তারা বাদশাহকে প্রতিদিন একটি করে সিজদা

---

১৪. মুন্তাখাব পৃঃ ২২৬

দিতো, এই সিজদার নাম যমিনবুস্ (ভূমি-চুম্বন) রাখা হয়েছিল। এই অপকর্মে কোন কোন সূফীও শরীক ছিল। তাসাউফ সম্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'নজ্হাতুল আরওয়াহ্'-এর ভাষ্যকার তাজুল আরেফীন সাহেব তো বাদশাহ্র সম্মানার্থে এই ভূমি-চুম্বনকে 'ফরজে আইন' (অপরিহার্য কর্তব্য) বলে ফতোয়াও দিয়েছিলেন। তিনি "বাদশাহ্র জন্যে সিজদাকে ওয়াজিব ঘোষণা করে, এর নাম রাখেন 'যমিন বুস্' এবং বাহ্দশার সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখাকে 'ফরজে আইন' বলেন। কেননা বাদশাহ্র মুখমণ্ডল হলো প্রয়োজন ও অভাবপূরণের কেবলা এবং উদ্দেশ্যের কাবা। তিনি কোন কোন দুর্বল রেওয়ায়ত এবং ভারতের কোন কোন সূফীর কার্যপদ্ধতি থেকে তাঁর এই দাবী প্রমাণ করেন।[১৫]

ফলে ভূমিচুম্বন রূপ সিজদার এই রীতি সাধারণ লোকদের মধ্যে জারী হয়ে যায়। আকবরের আমলে শুধু সাধারণ লোকদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। কোন কোন বিশিষ্ট আলেমকেও এই মুশ্রেকানা অপকর্মে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। একজন বিশিষ্ট আলেম কিভাবে বাদশাহ্র সম্মানার্থে ভূমি-চুম্বন করেছিলেন, মোল্লা বদায়ুনী লেখনীর মাধ্যমে এর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন—এই মৌলভী যখন শাহী দরবারে হাজির হলো, তখন—

"ঘাড় বাঁকিয়ে সম্রাটকে কুর্নিশ করলো এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাতজোড় করে ও চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইলো। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন বসার অনুমতি মিলল, তখন সাথে সাথেই সে সিজদায় নুয়ে পড়লো পরে উটের ন্যায় বসলো।"[১৬]

এ হলো আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীর আকীদা-বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার অবস্থা। কিন্তু এই ধর্মের আচার-পদ্ধতি সংস্কার ও হালাল-হারাম বোধের কাহিনী আরো দীর্ঘ। সংক্ষেপে সেগুলোর আলোচনাও প্রয়োজন।

১৫, মুন্তাখাব -পৃঃ ২৫৯

১৬. ঐ পৃঃ ২৪৭

সুদ ও জুয়ার বৈধতা

বদায়ুনী বলেছেন,—

"সুদ এবং জুয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। এর উপরই অন্যান্য হারাম বস্তু সম্পর্কে অনুমান করা যায়। একটি জুয়া-ঘর খাস দরবারেই বানানো হয়েছিল। এবং শাহী কোষাগার থেকে জুয়াড়ীদেরকে সুদে ঋণ দেওয়া হতো।" মোল্লাসাহেব বলছেন, ফতোয়া দেওয়া হলো যে—

শরাব ঃ—

"শারীরিক সুস্থতার জন্যে ঔষধ হিসাবে যদি শরার ব্যবহার করা হয় এবং তা পান করার ফলে যদি কোন ফেত্না-ফাসাদের সৃষ্টি না হয়, তাহলে যে কোন অবস্থায় শরাব পান করা যায়েজ। তবে সীমাতিরিক্ত নেশা করা, আর তার ফলে লোকেরা একত্রিত হয়ে শোর-গোল করা নিষিদ্ধ। শোরগোলের খবর যদি বাদশাহ পেয়ে যেতেন, তাহলে কঠোরভাবে পাক্ড়াও করতেন।"

আর স্বয়ং বাদশাহ "শাহী দরবারের পাশেই একটি শরাব বিক্রয় কেন্দ্র খোলেন এবং শরার বিক্রেতাদের বংশোদ্ভূত জনৈকা সুন্দরী যুবতীকে এর পরিচারিকা নিযুক্ত করেন। শরাবের মূল্যও স্বয়ং বাদশাহ্ই নির্দিষ্ট করে দেন।" (মুন্তাখাব)

শুধু তাই নয়, "নওরোজের উৎসব অনুষ্ঠানসমূহে শরাব পানের আসর বসতো। তাতে অধিকাংশ আলেম এমনকি কাজী (বিচারপতি) এবং মুফতীদেরকে পর্যন্ত নিয়ে আসা হতো।' (মুন্তাখাব)

এই উৎসবে চারদিকে শরাব পানের মহা ধুম পড়ে যেতো। বিভিন্ন ব্যক্তির নামে শরাব পান করা হতো। মোল্লা সাহেব লিখেছেন ঃ—

"মালিকুশ্ শোয়ারা" (কবি-সম্রাট) ফৈজী মদপানের সময় বলতেন, এই পিয়ালা আমি ফকিহ্দের (ফিকাহ্শাস্ত্রবিদ) অন্ধত্ব ও গোড়ামীর নামে পান করছি।"

দাড়ির দুর্দশা মদ যায়েজ করার পর সম্রাট আকবর তার নব প্রবর্তিত ধর্মে যে বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা ছিল দাড়ি মুণ্ডন। দাড়ি

রাখা তাঁর ধর্মে হারাম। এই হারাম প্রমাণের জন্যে তিনি বহু যুক্তি ও কিতাবী তথ্যের অবতারণা করেছিলেন। তাঁর হাস্যকর যুক্তি ও অবমাননাকর উক্তিটি ছিল এই—

"দাড়ির খাদ্যরস সঞ্চয়িত হয়ে থাকে অণ্ডকোষ থেকে। কারণ, কোন খোজারই (হিজরারই) দাড়ি হয় না। সুতরাং দাড়ি রাখাতে কি সওয়াব হতে পারে?"[১]

দাড়ি মুণ্ডনের বৈধতা প্রমাণের জন্যে যে কিতাবী দলীলের অবতারণা করা হয়েছে, তা আরো হাস্যকর। আকবর প্রবর্তিত ধর্মের ভিত্তি যে কত দুর্বল, এই যুক্তি দেখলেই তা বুঝা যাবে এবং আকবরের দৃষ্টি-ভঙ্গিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ফিকাহ্‌শাস্ত্রের কোন কিতাবে নাকি লিখা আছে এমনভাবে দাড়ি মুণ্ডন করো না, যেমনভাবে করে থাকে ইরাকের কোন কোন আওবাশ (اوباش)—আরবী ভাষার শব্দ। আওবাশের অনুবাদ করা হয় উসাত عصاة। জনৈক মৌলভী আরবী আইন (ع) হরফটিকে কাফ (ق) বানিয়ে ছাড়েন, সোয়াদ (ص)-এর উপর একটি বিন্দু বসিয়ে দেন এবং عصاة শব্দটিকে قضاة বানিয়ে ফেলেন। আর শাহী দরবারে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত এই আরবী বাক্যটিকে এভাবে পেশ করেন— كما يفعله قضاة العراق—অর্থাৎ যেভাবে ইরাকের কাযীগণ দাড়ি মুণ্ডন করেন। এটিই হলো আকবরের দাড়িমুণ্ডনের দলীল। কেননা, ইরাকের কাযীগণ যখন দাড়ি মুড়িয়ে ফেলেন, তখন মুসলিম ভারতের কাযীগণ কেন মুড়াবেন না? আর কাযীগণ যখন মুণ্ডাবেন তখন সাধারণ লোকের পক্ষে তা মুণ্ডন করা বৈধ না হয়ে যায় কোথায়!

মোল্লা আবু সাঈদ পানিপথী নামক জনৈক বিশিষ্ট আলেম তাঁর লিখিত পুরাতন পাণ্ডুলিপির মধ্যে দাড়িমুণ্ডনের স্বপক্ষে একটি হাদীসও নাকি পেয়ে যান, এবং শাহী দরবারে তা পেশও করেন। মোল্লা বদায়ুনী তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে এটিকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। মোল্লা সাহেবের ভাষায় এর অনুবাদ হলো—

"জনৈক সাহাবীর ছেলে দাড়িমুণ্ডন করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ বেহেশতবাসীদের আকৃতি এরূপই হবে।"

এ সব দলীল প্রমাণ জোগাড় করে আকবর স্বয়ং দাড়ির মূলোৎপাটন করেন,—অন্যদেরকেও দাড়ি মুড়ানোর নির্দেশ দেন। মোল্লা বদায়ুনী তাঁর গ্রন্থে এই তারিখটিও লিখে রাখেন। তখন ছিল ৯৯০ হিজরী। এ সময় আকবরের বয়স ছিল ৪০ বছর। বাদশাহর দেখাদেখি দরবারের বড় বড় আলেম-ফাজেলরাও আপন আপন দাড়ি মুণ্ডন করে বাদশাহর প্রতি চরম আনুগত্য ও নিষ্ঠার প্রমাণ দেন।

ফরয গোসল

সম্রাট আকবর তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে ফরজ তুলে দেন। মোল্লা বদায়ুনী লিখেছেন—

সঙ্গমের পর নাপাকীর কারণে গোসল ফরজ হওয়ার বিধিটাকে বাতিল করে দেয়া হলো। কারণ, বীর্য নেক লোকদের পয়দায়েশের মূল। তাই সঠিক ব্যবস্থা এই যে, প্রথমে মানুষ গোসল করবে, তারপর সহবাসে লিপ্ত হবে।

বিয়ে

দ্বীন-ই-ইলাহীতে বিয়ে সম্পর্কেও বহু নতুন নতুন আইন জারী করা হয়। চাচাত বোন, খালাত বোন ও মামাত বোনের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কেননা, এতে ভালবাসা ও পারস্পরিক আকর্ষণ নাকি হ্রাস পায়। তাছাড়া এই আইনও করে দেয়া হয় যে,—"ষোল বছরের পূর্বের ছেলেদের চৌদ্দ বছরের পূর্বে মেয়েদের বিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। কেননা এতে সন্তানাদি দুর্বল হয়। (মুন্তাখাব)

ইংরেজ আমলের সারদা এ্যাক্ট এবং আমাদের দেশের পরিবার পরিকল্পনা আইন সম্রাট আকবরের এই আইনেরই আধুনিক সংস্করণ। মোল্লা বদায়ুনী লিখেছেন যে, মুসলমানগণ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিয়ের বয়সকে ওজর হিসেবে পেশ করেছিলেন। কিন্তু বাদশা

১৭. মুন্তাখাব, পৃঃ ২৪৭.

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিয়ের এই বয়সের সত্যতা অস্বীকার করেন। তা ছাড়া প্রয়োজনেও একাধিক স্ত্রী লোকের সঙ্গে বিয়ে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। যুক্তি স্বরূপ বলা হয় যে, "আল্লাহ্ এক এবং নারীও এক" আরো হুকুম জারী করা হয় যে, যেসব মহিলার মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে, তারা আর বিয়ে করতে পারবে না, যেসব নারীর বয়স পুরুষের চেয়ে বার বছর বেশী তারা উভয়ে যৌন সম্ভোগ করতে পারবে না। বিয়ের জন্যে সরকারী সার্টিফিকেট হাসিল করা বর-কনের পক্ষে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। হুকুম দেওয়া হয় যে, তাদের উভয়কে কোতোয়ালীতে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তাদের সঠিক বয়সের সার্টিফিকেট হাসিল করতে হবে। তা না হলে তাদের বিয়ে বৈধ হবে না, তা সরকারী স্বীকৃতি পাবে না। এর পরিণাম এই হলো,

"এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মচারীদের জন্যে অর্থোপার্জনের দারুণ সুযোগ হয়ে গেল। বিশেষত কোতোয়াল, অপরাপর কর্মচারী এবং তাদের সহযোগী ও অধীনস্থরা—যারা সাধারণত ইতর ও নিকৃষ্ট জাতীয় লোক—তারা এই আইনের ফলে যত লাভবান হয়েছে, তার পরিমাপ সুকঠিন।"[১৮]

পর্দা

পর্দাপ্রথা উচ্ছেদ আধুনিক কালের কোন কীর্তি নয়। আকবর তাঁর দ্বীন-ই-ইলাহীতেও এই পর্দাপ্রথা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বদায়ুনী বলছেন—

"যেসব যুবতী নারী হাট-বাজারে যাতায়াত করে, পথ চলাকালে অবশ্যই তারা মুখ খোলা রাখবে অথবা সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে চলবে।"

জেনা-ব্যভিচারের সুব্যবস্থা

আকবরের আমলে কোন কোন স্বার্থপর আলেম 'মুত্আ' বিয়েকে জায়েয বলে ফতোয়া দেন। তাঁরা এজন্যে হানাফী ফিকাহ্শাস্ত্রের দোহাই পাড়েন। তাতে কোথায় নাকি 'মুত্আ' বিয়ে জায়েয রাখা হয়েছে। কোন

---

১৮. মুন্তাখাব, পৃঃ ৩৯১

কোন মৌলভী এমন স্বকপোলকল্পিত কথাও আকবরকে অবহিত করেন যে কোন কোন মুজতাহিদের নয়টি, এমনকি অনেকে এরও অধিক সংখ্যক স্ত্রী নাকি একই সঙ্গে রাখা জায়েয বলেছেন। তবে, এ হলো দ্বীন-ই-ইলাহী প্রচারের পূর্বের কথা। কিন্তু নতুন ধর্মে একাধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে আমরা স্ত্রী বন্ধ্যা হলে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেওয়া হতো। একদিকে এই ছিল অবস্থা। অথচ অপরদিকে বিয়ে এবং মুত্‌য়া ছাড়াও জেনা ও ব্যভিচারেরও অনুমতি ছিল। মনে হয়, আইনত জেনা হারাম ছিল না। কেবলমাত্র তা শৃঙ্খলায়িত করার জন্যেই আইন বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মোল্লা বদায়ুনী লিখছেন—

"শহরের বাইরে বেশ্যাপল্লী তৈরী করে দেওয়া হয়। এর নাম রাখা হয় শয়তানপুর। ওখানে যথারীতি রক্ষক, পাহারাদার ও দারোগা নিযুক্ত ছিল। উদ্দেশ্য, বারবণিতাদের সাথে যারা মিলতে চায় কিংবা তাদের বাড়ী নিয়ে যেতে চায়, তারা যেন এদের কাছে আপন আপন নাম ধাম ও বংশ লিখিয়ে রাখতে পারে এবং ও সব কর্মচারীর অনুমতিক্রমে বেশ্যাদের সাথে যা ইচ্ছা করতে পারে।"

বারবণিতাদের সঙ্গে জঘন্যতম অপকর্ম করারও অনুমতি আইনে ছিল। তবে এই সুযোগ একমাত্র বাদশার ঘনিষ্ঠদের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। মোল্লা বদায়ুনী বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করেছেন। রুচি-বিরোধী হওয়ার কারণে তা এখানে উল্লেখ করা সমীচিন নয়।

খত্‌না

ছেলেদের খত্‌না করা ইসলামে সুন্নত। কিন্তু আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীতে এই সুন্নতের উপরও হস্তক্ষেপ করা হয়। অথচ স্বয়ং এই নতুন ধর্মের প্রবর্তকেরও খত্‌না করা হয়েছে। এই ধর্মপ্রচারের পূর্বে আকবর তার শাহযাদাদের খত্‌না করিয়েছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলিমের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব যখন বাদশাহর মনে জাগলো তখন তিনি ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি সম্পর্কে এই আইন জারী করে দিলেন যে,—

"বার বছর বয়স হওয়ার পূর্বে ছেলেদের খত্‌না করানো চলবে

না। বার বছরের পর ছেলেদের এটা ইচ্ছা হ'লে করবে না হ'লে করবে না।"[১৯]

এটা স্পষ্ট যে, বার বছর পর কোন বালকই এই কষ্টকর কাজের প্রতি আগ্রহী হতে পারে না। তাছাড়া অন্যদিকে স্বয়ং সরকার এ সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করে থাকেন। সুতরাং এতে পরোক্ষভাবে খত্না বন্ধ করে দেয়ার গোপন ষড়যন্ত্রই করা হয়েছিল এবং হিন্দু মুসলমানকে অন্তত এ ব্যাপারে এক রাখার চেষ্টা চলেছিল।

মৃতের দাফন

এ ব্যাপারেও দ্বীন-ই-ইলাহীতে নতুন নির্দেশ জারী করা হয়। ইসলামে মৃত দেহকে কবরে দাফন করারই আদেশ রয়েছে। কিন্তু এই নতুন ধর্মগ্রহণকারীদের কেউ মারা গেলে তার মৃত দেহ সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হলো যে, বিনষ্ট খাদ্য এবং কঠিন ইট মুর্দার ঘাড়ে বেঁধে তাকে পানিতে ছেড়ে দেবে। আর যেখানে পানি না থাকবে সেখানে তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে, অথবা দুষ্কৃতিকারীদের ন্যায় মৃতদেহকে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবে।

মনে হয় মৃতদেহকে ডুবিয়ে দেয়া, জ্বালিয়ে দেয়া, কিংবা ঝুলিয়ে রাখার আদেশ পরেই হয়েছে। কেননা, প্রথম দিকে এই নির্দেশ ছিল না। তখন দাফনের বিরোধিতা করা হয়নি। তখন হুকুম ছিল—

"মৃতব্যক্তির মাথা পূর্বদিকে এবং পা পশ্চিম দিকে রেখে তাকে দাফন করতে হবে।"[২০]

আকবরের বিশিষ্ট মুরীদদের অন্যতম ছিলেন সুলতান খাজা। তাঁর মৃত্যুর পর আকবর তাঁকে ঠিক এভাবেই দাফন করেন। তদুপরি তাঁর কবরে যেন অনায়াসে রৌদ্রকিরণ ঢুকতে পারে সেজন্যে তাতে একটি জানালাও বানিয়ে দেয়া হয়েছিল।[২১]

"সূর্যের দিকে মুখ করে তিনি একটি খিড়কী (বাতায়ন) বানিয়ে দিয়েছিলেন যেন প্রতিদিন ভোরে সূর্যকিরণ তার মুখমণ্ডলে পড়তে পারে।

---

১৯. মুন্তাখাব পৃঃ ৩৭৬
২০. ঐ পৃঃ ৩৫৭
২১. ঐ পৃঃ ৪৪১

কেননা এর কিরণ পাপমোচনকারী।

মানুষকে একথা বলতেও শোনা গেছে, "তাঁর মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

"সম্রাটের হঠকারিতা এতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল যে, ঠিক কাবা শরীফের দিকে পা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে যেমন দাফনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনি, স্বয়ং নিজেও শোয়ার জন্যে ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন।"[২২] অর্থাৎ আকবর স্বয়ং ঠিক কেবলার দিকেই পা রেখেই শুতেন।

এই ছিল সেই দ্বীন-ই-ইলাহী, সম্রাট আকবর যা প্রবর্তিত করেন। ইসলামের বিরোধিতা করাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই জীবনের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ইসলাম নির্দেশিত সব ব্যবস্থাকেই আকবর ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। মোল্লা বদায়ূনীর বর্ণনায় জানা যায়, উপরোক্ত বিধি-বিধান ছাড়াও দ্বীন-ই-ইলাহীতে সোনা ও রেশমকে পুরুষদের জন্যে শুধু হালালই নয়—বরং প্রায় ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছিল। সে সময় যেসব আলেম এই নতুন ধর্ম কবুল করেছিলেন, কিংবা এর সমর্থক ও সহায়তাকারী হয়েছিলেন, তারা রেশমী বস্ত্র পরিধান করতেন এবং আল্লাহদ্রোহীর সকল হুকুম মেনে চলতেন। শুধু তা-ই নয় সম্রাট শূকর ও কুকুরকেও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন।

"ইসলামের বিরোধিতায় শুকর ও কুকুরের অপবিত্র হওয়ার নির্দেশকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং শাহী মহলের ভেতর বাইরে এই উভয় প্রকারের অপবিত্র জীব রাখা হতো। প্রত্যুষে এসব দেখা বাদশাহ ইবাদত বলে গণ্য করতেন।" (মুন্তাখাব)

আকবরের নবরত্নের একরত্ন, বিশিষ্ট আলেম ফৈজী সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে মোল্লা বদায়ূনী মন্তব্য করেছেন যে, তিনি সফর কালে কয়েকটি কুকুরকে সাথে সাথে রাখতেন। এই কুকুরগুলোর সঙ্গে একই পাত্রে খানা খেতেন। কোন কোন সময় কবি কুকুরগুলোর জিহ্বা পর্যন্ত নিজের মুখের ভিতর নিয়ে নিতেন।" (মুন্তাখাব)

এই ছিল দ্বীন-ই-ইলাহীর পুরো নকশা। এতেই নাকি সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। আকবর নাকি সর্ব ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে

২২. মুন্তাখাব পৃঃ ৩৫৭

দেখেছেন। আর এ জন্যে পাশ্চাত্য ও হিন্দু ঐতিহাসিকগণ তাঁর প্রশংসাও করেছেন অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একমাত্র ইসলামই আকবরের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল। তাছাড়া আর সব ধর্মই তার সুদৃষ্টি লাভ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধানগুলোই এক মাত্র অযৌক্তিক। তাছাড়া আর সবই যুক্তিভিত্তিক। তাই ইসলামের নির্দেশাবলীকে রদ করা হয়েছে। আর অন্যান্য ধর্মের বিধিগুলোকে এমন কি কুসংস্কারগুলোকে পর্যন্ত দ্বীন-ই-ইলাহীর অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এর মধ্যে রাখীবন্ধনের প্রতীক হাতে বাজুবন্ধ ব্যবহার অন্যতম। বাদশা এটা সবসময় হাতে রাখতেন। বিশেষত হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী তাদের উৎসব দিনে বাদশা তা ব্রাহ্মণদের হাত থেকে খুলে নিয়ে আপন হাতে পরতেন। এটি হীরকখচিত ছিল। সম্রাট কল্যাণকর মনে করেই তা করতেন। কিন্তু তাঁর ধারণা, এতে হিন্দুরাও খুশী হবে, দেবতারাও সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে।

শিবরাত্রিতে বাদশা যোগীদের সঙ্গে কয়েকরাত বিনিদ্র রজনী কাটাতেন। অথচ ইসলামের শবেকদর কিংবা অপর কোন পবিত্র রাত তাঁর পছন্দ হয়নি। সম্রাট একদিকে সিংহ ও চিতাবাঘের মাংস হালাল করে দিলেন, অপর দিকে "গরু, মহিষ, ঘোড়া, এবং উটের গোশ্‌ত হারাম, বলে ঘোষণা করলেন।" (মুন্তাখাব) এরই সঙ্গে অপর একটি আইনও জারী করলেন, জবাই করা যার পেশা, তার সঙ্গে যে ব্যক্তি খানা খাবে, তার হাত কেটে দেয়া হবে। এমনকি তার স্ত্রীও যদি তার সাথে খানা খায়, তবে যেসব আঙুল দিয়ে খানা খেয়েছে, সেসব আঙুল কেটে ফেলা হবে।' (মুন্তাখাব পৃঃ ২৭৬) এতে মনে হয় সাম্রাজ্যে হালাল পশু জবাই এবং তার গোশ্‌ত খাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা দেওয়াই আকবরের উদ্দেশ্য ছিল।

এতো ছিল খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে নতুন ধর্মের বিধান। আকবর এর চেয়েও আরও বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। দ্বীন-ই-ইলাহীর এরূপ একটি আইনও আকবর জারী করেছিলেন,

"যদি কোন হিন্দু নারী কোন মুসলমান পুরুষের প্রেমে পড়ে এবং মুসলমানদের ধর্ম গ্রহণ করে, তবে সেই নারীকে কঠোর ও নির্মমভাবে

ছিনিয়ে নিবে এবং তার পরিবারের লোকদের কাছে ফিরিয়ে দিবে।"[২৩]

মুসলমানদের প্রতি বাদশার এই দৃষ্টিভঙ্গি জাহাঙ্গীরের আমলেও মুসলমানদের করুণ ইতিহাস মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

"ভারতের অমুসলমানরা নির্বিঘ্নে ও নির্দয়ভাবে মসজিদ সমূহকে ধ্বংস করছে এবং সে স্থানে নিজেদের মন্দির গড়ে তুলছে। একইভাবে কাফেররা প্রকাশ্যভাবে কুফরী কাজকর্ম করে যাচ্ছে মুসলমানদেরকে ইসলামের হুকুম আহকাম আদায় করতে দেয়া হচ্ছে না।"[২৪]

এই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে আকবারের দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ দাবী করা হয়েছিল যে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হবে, সবার সঙ্গে সমান আচরণ করা হবে, সবাই সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে। আর কার্যত তা ছিল দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

মোল্লা বদায়ূনী আকবরের মৌখিক একটি বিবৃতি উল্লেখ করেছেন, একদিন বাদশা জনতার এক সমাবেশে ভাষণ দানকালে স্বীয় মত জাহির করেন,—

"হিন্দী ভাষায় গ্রন্থসমূহ—যা ভারতের মুনি, ঋষি ও জ্ঞানীদের রচিত —এর সবই সত্য। এগুলো সম্পূর্ণ নির্ভীক জ্ঞানের উপর ভিত্তিশীল। আর ঐ গোষ্ঠীর (হিন্দুদের) সকল বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার উৎস মূলই হলো এই গ্রন্থগুলো; সুতরাং আমরা হিন্দী থেকে নিজেদের নামে ফারসী ভাষায় এই গ্রন্থগুলো অনুবাদ না করবো কেন? ... ...এর দ্বারা আমাদের ইহকাল ও পরকালের চিরন্তন উন্নতি, সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য হাসিল হবে। প্রচুর সম্পদ ও অধিক সন্তান লাভ করা যাবে।"[২৫]

এই উদ্দেশ্যে অনুবাদ বিভাগ খোলা হলো। আলেমগণ নিযুক্তি-পত্র পেলেন, তাঁরা এসব গ্রন্থের অনুবাদে লেগে গেলেন, এর প্রকাশ প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। অথচ আরবী ভাষা ও

---

২৩. মুন্তাখাব পৃঃ ২৯২

২৪. মাকতুবাতে মুজাদ্দিদ পত্র নং ৯৩ ছয়খণ্ড পৃঃ-১৬২)

২৫. মুন্তাখাব, পৃ, ৩২০

ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্রাটের ব্যবহার ছিল খুবই মর্মান্তিক। মোল্লা বদায়ূনীর ভাষায়—

"আরবী পড়া, আরবী জানা দূষনীয় বলে ঘোষণা করা হলো। তাফসীর ও হাদীস অধ্যয়নকারিগণ মরদুদ ও অভিশপ্ত বলে খেতাব পেলেন।" এভাবে হাদীস তাফসীর ও ফিকহ পড়া বন্ধ করে দেয়া হলো আর তদস্থলে জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ডাক্তারী, অংকশাস্ত্র, কবিতা ইতিহাস এবং প্রচলিত গল্পগুজব শিক্ষা চালু করা হলো। মোল্লা সাহেব লিখেছেন,—

ঐ বছর ফরমান জারী হলো যে, প্রত্যেক জাতিকে আরবী শিক্ষা পরিত্যাগ করতে হবে। মূল্যবান বিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র, ডাক্তারী অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শন ব্যতীত তারা আর কিছুই পড়তে পারবে না।"[২৬]

এর পরিণাম কি ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ইসলামী শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল, আর শুধু পার্থিব তথা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই চাল রইল। এই পরিণামটি মোল্লা বদায়ূনী তুলে ধরেছেন,—

'মাদ্রাসা এবং মসজিদসমূহ বিরাণ হয়ে গেল। অধিকাংশ আলিম নির্বাসিত হলেন। তাঁদের অযোগ্য সন্তানেরা যারা এদেশে রয়ে গেলো—তারা বাজিগরীতে সুখ্যাতি অর্জন করতে লাগলো।

ব্যাপার এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। তখনও সারা ভারতবর্ষ থেকে আরবী শব্দ বিতাড়নের আন্দোলন শুরু হয়নি। তবে আকবরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন জিনিসের নাম রাখার ব্যাপারে এক্ষেত্রে তিনি হিন্দী শব্দ সংযোনকেই অধিক পছন্দ করতেন। যেমন তিনি হাতীর নাম রেখেছেন নাথ পুল, পীরপ্রসাদ ইত্যাদি। সম্রাট আকবর কথাবার্তায় নিত্য ব্যবহৃত আরবী শব্দকে ঠিক রেখে তার উচ্চারণকে দেশায়িত করতে চেয়েছিলেন। এই উচ্চারণকালে তিনি আরবী হরফের (বর্ণ) স্থলে দেশী হিন্দী হরফ বসিয়ে উচ্চারণ করার চেষ্টা চালিয়েছেন। মোল্লা বদায়ূনী লিখেছেন,—

---

২৬. মুন্তাখাব পৃঃ ৩৬৩
২৭. ঐ পৃঃ ২৭৪

"যেসব হরফ (বর্ণ) আরবী ভাষার সাথেই সম্পর্কিত—যেমন, ط ظ ص ض ع ح ث সেসব হরফকে সম্রাট কথা-বার্তায় ব্যবহার থেকে বাদ দিয়ে দেন।[২৮]

তিনি এসব হরফের উচ্চারণে আরবী রীতি বর্জন করেন এবং দেশীয় রীতি চালু করেন। যেমন عبد الله-কে ابد الله এবং اخرى-কে اهرى বলতেন। আর এভাবে বিকৃতি সাধন করতে পেরে খুবই আনন্দবোধ করতেন।

কিন্তু আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন। তাই শুধু কথা-বার্তা পর্যন্তই আকবরের এই অপচেষ্টা সীমায়িত ছিল। যদি আকবর শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এই রীতি বাধ্যতামূলক করে দিতেন--তা হলে আজ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মহা অবদান বিপুল গ্রন্থরাজির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হয়ে পড়তাম। অসম্ভব হয়ে পড়তো ওসব গ্রন্থরাজির গভীরে প্রবেশ করা এবং তার মর্ম উদ্ধার করা। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন রক্ষার দায়িত্ব স্বয়ং তাঁরই। তাই তিনি তা রক্ষা করেছেন। এবং ভবিষ্যতেও করবেন না।

বস্তুত এভাবে শিক্ষা বরবাদ করার জন্যে আকবর প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা। অপরদিকে আলেম পীর ইমাম এবং খাতীবদের শতাব্দীব্যাপী ভোগ-দখলকৃত ভূসম্পত্তি সমূহও তিনি বাজেয়াফত করা শুরু করে দিলেন। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে যেসব সম্পত্তি তারা ভোগ করে আসিয়াছেন—আর ইসলামী শিক্ষাকে জিইয়ে রাখছিলেন, আকবর এসব সম্পত্তির পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে লাগলেন। ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের এ ছিল তাঁর পরোক্ষ প্রয়াস। আকবরী আমলের পূর্বে এসব ভূমির পরিমাণ ছিল।

"হোদায়ার ন্যায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের কিতাব সমূহ শিক্ষাদানকারীদের জন্য কমবেশী একশো বিঘার জায়গীর নির্দিষ্ট ছিল। আর এটা ছিল ভূমির সর্বনিম্ন পরিমাণ।" (মুন্তাখাব)

আর আকবর ইসলামের প্রতি ইসলামী-শিক্ষার প্রতি কি আঘাত

---

২৮. মুন্তাখাব, পৃঃ ৩০৭

হেনেছিলেন—ইসলামী তাহজিব তামাদ্দুনের ধ্বংসসাধনে কিরূপ মেতে উঠেছিলেন, মুজাদ্দিদ-ই আলফেসানীর এক পত্রে এর যে দৃশ্যটি ফুটে উঠেছে তা যেমনি করুণ তেমনি মর্মান্তিক। তিনি লিখেছেন—

ইসলামী বসতি এলাকায় কাজী (বিচারক) নিয়োগ ইসলামী-অনুশাসনের সামগ্রিক রূপের মধ্যে অন্যতম পূর্ববর্তী যুগে (আকবরের আমলে) এটা মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল।" (প্রথম খণ্ড)

মুজাদ্দিদ সাহেব আরো উল্লেখ করেছেন "প্রায় এক যুগ ধরে ইসলামের সংকটময় অবস্থা বিরাজ করে। এই সময় অমুসলমানরা শুধুমাত্র এতটুকু করেই সন্তুষ্ট ছিল না যে, ইসলামী শহরগুলোতে প্রকাশ্য ভাবে কুফর চলতে থাক। বরং তারা তো এটাই চাচ্ছিল যে, ইসলামী হুকুম আহকাম সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া হোক এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কোন চিহ্নই বাকি না থাক। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, কোন মুসলমানের মাধ্যমে যদি ইসলামের কোন চিহ্ন প্রকাশ পেত তবে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা হতো। (মাকতুব নং ৮২, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১০৬)

এই পরিস্থিতি ছিল জাহাঙ্গীরের আমলের প্রথম দিকে। আকবরের সময়ে পরিস্থিতি কি রূপ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস করার পর মুসলমানদের সামনে শিক্ষার দ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে বাদশাহী ফরমান জারী করা হয় তা ছিল এই—

ইতর জাতির লোকদের শহরগুলোতে বিদ্যাশিক্ষা থেকে বিরত রাখা হোক। কেননা এই জাতি থেকে ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে থাকে।" (মুন্তাখাব পৃঃ ৩৫৬)

আকবর এখানে ইতরজাতি বলতে মুসলমানদেরকেই বুঝিয়েছেন। আর ধারণা করেছিলেন, এদেরকে অজ্ঞ ও মূর্খ রাখতে পারলেই তার সিংহাসন নিরাপদ হবে।

স্বার্থপর আলেমদের ফিতনা

রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, شرا شرا رشرا رشرا ر العلماء অর্থাৎ আলেমদের অনিষ্টাকারিতা ও খারাবী সকল অনিষ্ট ও খারাবীর

চাইতে ভয়াবহ। অন্যকথায় সকল অনিষ্টের মূল এদের অনিষ্ট-কারিতাই। ভাল জিনিষ যদি খারাব হয় তবে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। সাধারণ ভাত ও তরকারী নষ্ট বা গন্ধ হলে, তা খাওয়া তো দূরের কথা তার কাছে যাওয়াও দুষ্কর হয়ে পড়ে। তেমনি সাধারণ লোকের বিভ্রান্তি এমন কিছু ক্ষতির কারণ হয় না। কিন্তু আলেম সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। এর প্রমাণ যুগে যুগে দেখা গিয়েছে। সম্রাট আকবরের আমলে এই স্বার্থপর আলেমদের বিপক্ষগামিতা কি চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। শাহী দরবারের ধর্ম-নেতা, আলেম ও ফকীহ্‌গণ কিভাবে বাদশাহকে ভ্রান্তপথে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে সাহেবের সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে বুঝতে হলে—এর বিস্তারিত বর্ণনারও প্রয়োজন রয়েছে।

আকবরের প্রথম জীবন

আকবর নানাবিধ কারণে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তাই সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর না হলেও তিনি শিক্ষিত ছিলেন না মোটেই। পরবর্তী জীবনে তাঁর মধ্যে যেসব অন্যায় দেখা যায় প্রথম জীবনে তা ছিল না। বদায়ুনী লিখেছেন ঃ

"বাদশা মৌলিক মানবীয় গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং সত্য অনুসন্ধিৎসুও ছিলেন। তবে দোষ এই যে, তিনি চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।" (মুন্তাখাব পৃঃ ২৫৫)

তাঁর প্রাথমিক জীবন পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, তিনি কঠোরভাবে ইসলামী ইবাদতগুলো আদায় করতেন। যথারীতি নামা-যের পাবন্দ ছিলেন। এমন কি সফরকালে পর্যন্ত তাঁর জামায়াত তরক হতো না। এজন্যে সাতজন বিশিষ্ট আলেম নির্দিষ্ট ছিলেন। এদের মধ্যে মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী অন্যতম। স্বয়ং তিনিই সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

"বাদশাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়েই প্রকাশ্য দরবারে জামায়াতে নামায আদায় সম্পর্কে নসীহত করতেন।" (মুন্তাখাব পৃঃ ৩১৫)

সফরে বিশেষ একটা তাঁবু নামাযের জন্যে থাকতো। বাদশাহ এতে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতেন। দ্বীনি শিক্ষা ও আলেমদের প্রতি বাদশাহ খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাতেন। শেখ আবদুন্নবী আকবরের আমলের প্রথমদিকে "সদর-ই-জাহান" ছিলেন। এ সময় তাঁর প্রতিও আকবর যে সদ্ব্যবহার করেছেন তা ছাড়াই তাঁর দ্বীন ও আলেম-প্রীতির অনুমান করা যায়। বদায়ূনী লিখেছেন ঃ

"নিতান্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের কারণে বাদশাহ কখনও কখনও হাদীস শোনার জন্য তাঁর গৃহে যেতেন (শেখ আবদুন্নবীর)। দু'একবার তো বাদশাহ শেখের জুতাও এগিয়ে দিয়েছেন।"[১]

প্রথম দিকে আলেম ও বুজর্গগণের সংসর্গ আকবরের খুবই প্রিয় ছিল। হযরত শেখ সলীম চিশ্‌তীর সাহচর্যে থাকার উদ্দেশ্যেই বাদশা শেখের বাড়ীর নিকটস্থ ফতেহপুরকে রাজধানী বানিয়েছিলেন। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বহুবার তিনি পদব্রজে দিল্লী থেকে আজমীর শরীফ গিয়েছিলেন। বাদশা নতুন রাজধানী ফতেহপুর একটি কূপ খনন ও তার চারপাশে বহু ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। এসবের নাম দিয়েছিলেন 'ইবাদতখানা', বদায়ুনীর বর্ণনায় জানা যায়, "এই ইবাদতখানার আবাসিক এলাকা থেকে দূরে একটি জীর্ণশীর্ণ কুঠরী ছিল। বাদশা প্রথম জীবনে একা সে কুঠরীতে যেতেন, তাতে স্থাপিত একটি পাথরের উপর বসতেন, নির্জনে ধ্যানমগ্ন হতেন এবং ভোরের ফয়েজ হাসিল করতেন।"[২]

জুম্‌য়ার নামাযের পর ওই প্রাসাদেই আলেমদের সমাবেশ হতো। বাদশাহ এতে হাজির থাকতেন এবং আলেমদের ধর্মচর্চা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। পরে এর প্রতি বাদশাহর আগ্রহ ও উৎসাহ এতই বেড়ে যায় যে, শুক্রবারের পুরো রাতটিই তিনি আলেম ও বুজর্গদের সাথে কাটিয়ে দিতেন। আলেম ও বুজর্গদের যথোপযুক্ত সমাদর করতেন, যোগ্যতা অনুসারে তাদেরকে পুরস্কৃতও করতেন। ফল হয় বিপরীত। এই সমাদর ও পুরস্কারের লোভে বহু স্বার্থপর পীর ও আলেম জুটে

---

১. মুন্তাখাব পৃঃ ৩১৫।

২. ঐ. পৃঃ ৩১৫।

যায়। মধুর লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে আলেমরা মৌমাছির মত বাদশাহর চার-পাশে এসে জমায়েত হয়। বিতর্কে অংশ নেয়। মোল্লা সাহেবের কথায় ঃ

"বাহাস ও বিতর্কে অংশগ্রহণকারী আলেমদের সংখ্যা শতাধিক ছিল। এদের মধ্যে যেমন ছিল শাস্ত্রাভিজ্ঞ আলেম, তেমনি ছিল অনেক অন্ধ মুকাল্লেদও।"

এরা ছিল স্বার্থপর, লোভী। দ্বীনের চেয়ে দুনিয়া ছিল এদের বেশী প্রিয়। তাই শাহী দরবারে এদের উপস্থিতি এক বিরাট ফিত্‌নার) কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাদশাহকে ইসলামের সঠিক মর্ম বোঝানোর চাইতে বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই স্বার্থ ভরা মন নিয়ে এরা শাহী দরবারে যোগদান করায় নানারূপ ফিত্‌না ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। বাদশাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কার আগে কে বাদশাহকে অধিক তুষ্ট করতে পারবে, কে আগে বাদশাহর সুদৃষ্টি লাভে সমর্থ হবে—এ নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। পরে দলাদলি, তারও পরে ঘটে মারামারি। এভাবে তাদের আসল রূপ প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় আরও অনেক গর্হিত কার্যকলাপ। বাদশাহ প্রথমে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও প্রজ্ঞার সাথে চলেন। মনের রাগ মনেই গোপন রাখেন। কিন্তু কয়দিন তা রাখা যায়। বাদশাহর কাছে তাদের মর্যাদা লাঘব হতে থাকে। এমন হতে হতে এক সময় দ্বীনের এসব খুঁটিকে ঘুণে ধরে যায়। দ্বীনের পুরো ভিতটি টলে ওঠে। তাদের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির কাহিনী অতি দীর্ঘ। সংক্ষেপে বদায়ুনীর ভাষায় তাদের অবস্থা এরূপ ছিল ঃ

"একে অন্যের প্রতি কাদা ছুঁড়তে থাকে। অশ্লীল বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। একজন আরেকজনের বিরোধিতায় এমনি তৎপর হয়ে ওঠে এবং তাদের দ্বন্দ্ব এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে, একে অপরকে কাফের বলে গালি দেয়, পরস্পরকে গোমরাহ (ভ্রষ্ট) হওয়ার ফতোয়া দেয়।" ঐ

শাহী দরবারের এসব স্বার্থপর মৌলভী এমনি মোহান্ধ হয়ে পড়ে যে, তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, দরবারের আদব-কায়দা ভুলে

যায়। তাদের ঘাড়ের রগ মোটা হয়ে ওঠে, সাহস বৃদ্ধি পায়। ফলে শাহী দরবারে বাদশাহর সামনে তারা চেঁচামেচি এবং চিৎকার করা পর্যন্ত শুরু করে দেয়।

বাদশাহ এমনিতেই তাদের আচরণে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন, তদুপরি তাদের এই অশোভন, অভদ্রজনোচিত ও রুচীহীন কার্যকলাপে রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। মোল্লা আব্দুল কাদেরকে কড়া নির্দেশ দেন যে, এসব আলেমদের যারা অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, দরবারের রীতি ভঙ্গ করে এবং নীচতা দেখায়, ভবিষ্যতে তাদেরকে কিছুতেই যেন দরবারে আসতে দেওয়া না হয়। দ্বীনের ধ্বজাধারী এসব স্বার্থপর আলেম বাদশাহর নিকট থেকে এ-ই প্রথম মার খায়। তবুও বাদশাহর দরবারে তাদের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু তা হলেও তাদের এই আগমনে, তাদের কর্থা-বার্তায় বাদশাহর ঈমান দৃঢ় হওয়ার পরিবর্তে দুর্বলই হতে থাকে। দ্বীন সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ বৃদ্ধি পেয়ে চলে। এরপরও তাদের হুঁশ হলো না—জ্ঞান ফিরে এলো না। তাদের একজন কোন জিনিসকে হালাল বললে অপর একজন সেটাকেই হারাম ঘোষণা করতো। ফলে বাদশাহ দ্বীন সম্পর্কেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

এসব আলেমের মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিলেই সবার অপকীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাদের একজন ছিলেন মোল্লা আবদুল্লাহ সুলতানপুরী। লাহোর ছিল তাঁর নিবাস। তাঁর উপাধি ছিল —

"মাখদুমুল মুল্ক।" মুসলমানদের হজ্জ যাতে করা না লাগে, শুধু এ জন্যেই তিনি হজ্জ ফরয নয় বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। যাকাত সম্পর্কেও তিনি চালবাজির ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সকলকে বলেছিলেন, প্রতি ছমাস অন্তর সম্পদের মালিক পরিবর্তন করে নিতে। ফলে পুরো এক বছর কেউ আর সম্পদের মালিক থাকবে না। সুতরাং যাকাতও কারো উপর ফরয হবে না। এবং তা দেওয়াও লাগবে না। কিন্তু এর পরিণাম তাকে দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয়েছিল। অত্যন্ত জিল্লতি ও অপমানের সাথেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর

বাদশাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সম্পূর্ণ সম্পদ তদন্ত করা হয়। মোল্লা বদায়ূনীর কথায়,—তদন্তের ফলে—

"এত গুপ্ত ধন বের হয়ে পড়ে যে, এসব ভর্তি সিন্ধুকসমূহের তালাগুলোকে কল্পনার চাবি দ্বারাও খোলা অসম্ভব ছিল। এসবের মধ্যে স্বর্ণে ভর্তি কয়েকটি সিন্ধুক মাখদুমুল-মুল্কের কবরস্থান থেকে আবিস্কার ও উদ্ধার করা হয়। মুর্দার আকারে তিনি এসবকে দাফন করে রেখেছিলেন।" (ঐ পৃঃ ৩১১)

আরেকজন ছিলেন মওলানা আবদুন্নবী। তিনি হযরত শাহ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গুহী (রঃ)-এর পৌত্র ছিলেন। আকবরের আমলের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দেস বলে মানুষ তাঁকে জানতো। বাদশাহ স্বয়ং তাঁর জুতাও সোজা করে দিয়েছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যের ইমাম ও খতিবদের জায়গীর (ভূমির মালিকানা) দানের সকল এখতিয়ার তাঁকেই দেয়া হয়েছিল। ক্ষমতা পেয়ে তিনি সারা সাম্রাজ্যের ধর্মীয় জায়গীরদারদেরকে দৌড়াতে লাগলেন। শেষে অবস্থা এমন এক স্তরে এসে পেঁছিয় যে, মানুষ মওলানার উকিল, পরিষদ, চাকর, নওফর এমনকি মেথরদেরকে পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে মনস্কাম হাসিল করতো।

মাখদুমুল-মুলক এবং মোল্লা অবদুন্নবীর মধ্যে ভীষণ শত্রুতা ছিল একে অন্যের বিরুদ্ধে পুস্তিকা পর্যন্ত প্রকাশ করেন। একজন অপরজনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। একজন বলেন, তোমার মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি আছে। এজন্যে তোমার পিছনে নামায জায়েয হবে না। অন্যজন এর উত্তরে বলেন, তুমি তোমার বাপের নাফরমান (অবাধ্য) ছেলে। অতএব তোমার পিছনেই নামায পড়া নাজায়েয। বস্তুত সকাল-বিকাল শাহী দরবারে আলেমরা অনুরূপ হাঙ্গামা এবং তর্ক-বিতর্কেই লিপ্ত থাকতেন। মোল্লা আবদুল কাদের বলছেন—যে, দুঃখের বিষয়, "মূর্খ আকবর তাঁর জমানার আলেমদেরকে ইমাম রাযী ও ইমাম গাজ্জালীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে ধারণা করতেন। সুতরাং এদের লজ্জাহীনতা ও স্বার্থপরতা দেখার পর বাদশাহ পূর্ববর্তীদেরকেও অপুরূপই ধারণা করে বসেন এবং এই কারণে অতীতের মনীষীদেরও বিরোধী হয়ে পড়েন।"

না হবেন কেন? এ যুগের রাযী যদি এরূপ হন—নিজের সুবিধা অনুযায়ী হাদীসকে পর্যন্ত বিকৃত করতে পারেন, আর এ যুগের গাজ্জালীর কবরস্থানে যদি স্বর্ণভতি সিন্ধুক পাওয়া যায়,—তবে অতীতের রাযী ও গাজ্জালীদের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করা সম্ভব?

এ ছাড়া কখনো কখনো বাদশাহর দরবারে পীররূপধারী ব্যক্তিরা আসতো—আকবরের সামনে মিথ্যা ভবিষ্যৎবাণী করতো। তারা বলতো—আপনার অমুক গর্ভবতী মহিষীর গর্ভে শাহজাদা জন্ম নিবে। অথচ হতো তার উল্টো। স্বার্থপর আলেমদের এসব কু-কাজ বাদশাহর ইসলামদ্রোহিতার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু সিলসিলায় সবচেয়ে বড় ফিত্নার সৃষ্টি করেন মোল্লা মোবারক নাগোরী এবং তাঁর স্বনামধন্য সন্তান আবুল ফজল ও ফৈজী।

মোল্লা মোবারক একজন উঁচুস্তরের আলেম ছিলেন। যুগের প্রায় সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি যদ্দিন নাগোরে ছিলেন তদ্দিন তর্কশাস্ত্র, ফিকাহ্ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) এবং উসুলে ফিকার (ফেকার মূলনীতি) চর্চায় নিমগ্ন থাকেন এবং বিষয়ের উপর খুব বুৎপত্তিও লাভ করেন। পরে তিনি আহমদাবাদ চলে যান। এ সময় মুসলিম ভারতের উপকূলবর্তী শহরগুলোতে তর্কশাস্ত্রের চেয়ে দ্বীনি এলেমের চর্চাই ছিল বেশী। মোল্লা মোবারক দ্বীনি এলেম চর্চার সর্বোত্তম সুযোগ পান। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ছিলেন অস্থিরচিত্ত, বিরোধীভাবাপন্ন এবং ঝগড়াটে। চার মাযহাব এবং এর এখ্তেলাফ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তিনি গায়েবে মোকাল্লেদ হয়ে যান। তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং আবুল ফজল লিখেছেন—

তিনি, ''মালিকী, শাফেয়ী, হানাফী, হাম্বলী এবং ইমামিয়া (শিয়াদের এক ফেরকা) মাযহাবের মূলনীতি (উসূল) ও অন্যান্য খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে সব রকম জ্ঞান হাসিল করেন, এবং কঠোর সাধনার পর ইজতিহাদের ক্ষমতা অর্জন করেন। যদিও পূর্ববর্তী মনীষীদের মত অনুযায়ী তিনি আবু হানিফার পন্থার সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তবুও সর্বদা ব্যক্তিগত গবেষণাকেই তিনি অধিক কাজে লাগাতেন। তিনি তাকলীদ অস্বীকার করতেন এবং নিজের রায়ই মেনে চলতেন।''

(আইন-ই-আকবরী আহ্ওয়ালে মুসান্নেফ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২০৩)

এ ছাড়া সুফীবাদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও তিনি ব্যাপক অনুশীলন করেন। এত বিদ্যার পণ্ডিত হওয়ায় স্বভাবতই তাঁর মধ্যে কিছুটা অহংকার কিছুটা অহমিকা ও বে-পরোয়াই দেখা দেয়। ফলে অন্যান্য আলেমরা তাঁর উপর ক্ষেপে যান এবং তাঁর সম্পর্কে অশোভন উক্তি ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। কিন্তু মোল্লা সাহেবও দমবার পাত্র নন। তাঁর অগাধ বিদ্যার অহংকার তাঁকে এক মারাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে। শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়ে তিনি আপন ছেলে আবুল ফজল ও ফৈজীকে সাথে নিয়ে দেশের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। সতরাং অচিরেই স্বীয় দক্ষতাগুণে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যান। উচ্চ সরকারী পদে আসীন হন। কিন্তু এক সময় তাঁর মনোভাব অন্যরূপ ছিল। যে কোন সরকারী পদ গ্রহণকেই তিনি ঘৃণা করতেন। পিতার এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আবুল ফজলের লেখায়। তিনি বলছেন—,

"শের খাঁ (শেরশাহ), সেলিম শাহ (শেরশাহের পুত্র) এবং অন্যান্য বুযুর্গগণ মোল্লা মুবারককে যেকোন উচ্চ সরকারী পদ গ্রহণের জন্য জোর অনুরোধ জানান। .... কিন্তু তিনি খুব সাহসী লোক ছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত ছিল। তাই সরকারী পদ গ্রহণ করতে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।"[১] কিন্তু সেই মোল্লা মুবারক পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ বদলিয়ে যান এবং সেই সরকারী পদের লোভে উভয় ছেলেকে নিয়ে সম্রাট আকবরের দরবারে হাজির হন। অবশ্য এটা সত্য যে, দরবারী আলেমরা তাঁকে ও তাঁর খান্দানকে খুবই কষ্ট দিয়েছিল। তাদেরই কারণে মোল্লা মুবারক এবং তাঁর পুরো খান্দানকে দ্বারে দ্বারে ফিরতে হয়েছে। এর প্রতিশোধ তিনি শুধু সুন্নী আলেমদের থেকেই নেননি,—বরং এই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তিনি ইসলামেরই চরম সর্বনাশ সাধন করেছিলেন। তখন তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল ইসলাম। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর যখন ইসলামের ভিত্ টলে উঠেছিল, মুসলিম মিল্লাত

১. আইন-ই-আকবরী আহওয়ালে মুসান্নেফ, ৩য় খণ্ড; পৃঃ ২০৫

ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল,—তখন স্বয়ং তার পুত্র আবুল ফজলও দারুণ আক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। মোল্লা মুবারক থেকে যে গোমরাহী ও ধর্মদ্রোহিতা শুরু হয়েছিল, তার পরিণতি বহু-দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।

আকবরের মুজতাহিদ হওয়ার খায়েশ

ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আকবরের নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছালো, তখন এই নির্যাতনের স্টীমরোলারের চাপে নিষ্পেষিত জাতির অমর-আত্মা জেগে উঠলো এবং প্রত্যাঘাত হানতে চাইলো। কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি, সামর্থ ও সাহস তাদের ছিল না। তাই এই দারুণ ক্ষোভ ও প্রবল উত্তেজনা অন্তরেই চাপা পড়ে রইলো, এবং আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করলো। যে-কোন মুহূর্তেই তা ফেটে পড়ার আশংকা দেখা দিল। আকবর মুসলমানদের এই ভাব লক্ষ্য করলেন এবং ভীষণ বিব্রতবোধ করতে লাগলেন। ওটা দমানোর উপায় উদ্ভাবনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়ে পড়লেন। ঠিক এই সময় মোল্লা মুবারক আলেমদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন।

আকবরের 'দ্বীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তনের পিছনে এই মোল্লা মুবারক নাগোরী ও তাঁর পুত্রদ্বয় আবুল ফজল এবং ফৈজীর হাতই সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ছিল। আকবর প্রথমেই স্বার্থপর আলেমদের দুর্ব্যবহারে মনক্ষুণ্ণ, ইসলাম সম্পর্কে সন্দিগ্ধ এবং মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ায় উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখানে সুচতুর মোল্লা নাগোরীর সক্রিয় সহযোগিতা পেয়ে পূর্ণ আশ্বস্ত হ'লেন। মোল্লা নাগোরী মুসলিম সমাজকে প্রতা-রিত করার উদ্দেশ্যে একটি 'হুকুমনামা' প্রকারান্তরে 'বয়াতনামা'-র খসড়া প্রস্তুত করেন ও বাদশাহ্‌কে তা দেখান। ওটা দেখে বাদশাহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। বাদশাহ প্রথমে তা তাঁর দরবারে পেশ করেন, দরবারের আমীর-উমরাহ্‌, আলেম ও জ্ঞানী-গুণীবৃন্দকে তাতে স্বাক্ষর দান করতে বলেন। অনেকেই স্বেচ্ছায় তাতে সই দেন। যেসব আলেম স্বেচ্ছায় দেয়নি—জোরপূর্বক তাদের থেকে স্বাক্ষর

আদায় করা হয়। এভাবে 'হুকুমনামায়' দরবারের ১৮ জন সদস্যের সই পাওয়া যায়। একমাত্র বীরবল ছাড়া স্বাক্ষরদানকারীদের মধ্যে আর সবাই ছিলেন মুসলমান। এদের মধ্যে আবার তদানীন্তন মুসলিম ভারতের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আলেম এবং ফকীহ্ও রয়েছেন। এ-রূপ একখানা 'বয়াতনামা'য় সই দিতে তাঁরা কুন্ঠা ও লজ্জাবোধও করেননি। 'হুকুমনামা'টি ছিল এই—,

"এসব 'হুকুমও নির্দেশ সন্নিবেশ করার উদ্দেশ্য হলো এই যে,—যেহেতু বাদশাহর ন্যায়নিষ্ঠ, সুবিচার ও ইন্সাফ এবং পৃষ্ঠ-পোষকতার কারণে হিন্দুস্থান আজকাল শান্তি, সম্পত্তি, শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে, এ কারণে বর্তমানে এখানে সাধারণ ও অসাধারণ লোকজন, বিশেষত এমন সব ওলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ ঘটেছে—যাঁরা মুক্তিপথের দিশারী এবং বিদ্যা-বুদ্ধি ও মান-মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা আরব ও আজম (অনারব দেশ) থেকে এদেশে শুভাগমন করেছেন এবং এদেশকেই স্থায়ী বাসভূমি বানিয়েছেন।

আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের নির্দেশ—

اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم -

অর্থাৎ আনুগত্য করো আল্লাহ্র, অনুগত হও রসুল (সঃ)-এর আর তোমাদের শাসনকর্তার। হাদীসের ঘোষণা,—

"নিশ্চয় কিয়ামতের দিন ওই শাসনকর্তা আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে অধিক প্রিয় হবে, যে ন্যায়পরায়ণ। যে লোক শাসনকর্তার আনুগত্য করলো, সে যেন আমারই হুকুম মানলো, আর যে শাসনকর্তার অবাধ্য হলো,—সে যেন আমারই নাফরমানী করলো।" এসব দলীল-প্রমাণ এবং অন্যান্য যুক্তি ও ইসলামী বিধি-বিধানের ভিত্তিতে সর্বপ্রকার জ্ঞানের পরিপূর্ণ অধিকারী, তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ বিষয়াবলীতে অগাধ পাণ্ডিত্যের দাবীদার, খাঁটি ঈমানদার, সততা, বিশ্বস্ততা, ও সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক জমহুর আলেমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, আল্লাহ্র কাছে একজন মুজতাহিদের চেয়ে ন্যায়পরায়ণ সুলতানের মর্যাদাই সমধিক।

"যেহেতু বাদশাহ জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবর গাজী অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান এবং মহাজ্ঞানবান নরপতি। মুজতাহিদ-দের মধ্যে যেসব ধর্মীয় মাসলা মাসায়েলের ব্যাপারে এখ্‌তেলাফ ও মতবিরোধ রয়েছে—তিনি যদি আপন প্রজ্ঞা, মেধা ও নির্ভুল রায়ের আলোকে,—বনি আদম যেন সরল ও সহজভাবে জীবিকার সংস্থান, ও জীবন নির্বাহ, এবং অবাধে বৈষয়িক ও পার্থিব প্রয়োজন পুরণে সমর্থ হয়—সেদিকে দৃষ্টি রেখে এখ্‌তেলাফী মাসায়েলগুলোর কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়ে তাকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তবে এমতাবস্থায় বাদশাহর এই ফয়সালাকে সর্বসম্মত রায় বলে বুঝতে হবে। আর সর্বসাধারণের পক্ষে তা অবশ্যপালনীয় হবে। তদ্রুপ বাদশাহ যদি বিবেচনাসম্মত জ্ঞান করে তাঁর প্রজাবৃন্দের কল্যাণে কোন আদেশ জারী করেন,—যদি কুরআন-সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরোধী না হয়—তা হলে এই আদেশ প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক ও অবশ্যপালনীয় হবে। আর এর বিরোধিতা পরকালে লা'নত ও লাঞ্ছনা এবং ইহজীবনে সমাজচ্যুতি ও ধ্বংস দ্বারা দণ্ডনীয় হবে।" মুন্তাখাব, তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭২

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, শ্রুতিমধুর ধর্মকথা ও বাক্যবিন্যাসের দুখাবরণে আকবর ও মোল্লা নাগোরী এবং অন্যান্য ইসলাম বিদ্বেষী উপদেষ্টাগণ 'হুকুম-নামা'টির মাধ্যমে ইসলামের মর্মমূলেই ছুরিকাঘাত হানতে চেয়েছিলেন। এই হুকুমনামার শর্তানুযায়ী কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ভাষ্যদান এবং ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত ও রায়-দানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে 'বাদশাহ জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবর গাজী'কে। বস্তুত একজন অগ্নি ও সূর্য উপাসক, আরবী হরফে পরিচয় জ্ঞানহীন অশিক্ষিত এবং স্বয়ং দেবতাজ্ঞানে পূজিত মদ্যপ ও লম্পট সম্রাটের হস্তে অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করে ইসলাম ও মুসলিম জাতির ধ্বংস সাধনের জন্য কিরূপ কূটকৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল—তা সহজেই অনুমেয়। আকবরের এই প্রতারণার কথা তাঁর ভক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক হেনরী জর্জ কীনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "বায়াতনামা'র মুখবন্ধ ও মূল অংশে ইসলামের

সাথে আপোষ ও তার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব লক্ষিত হ'লেও আসলে ওটা ছিল একটা নতুন ধর্মেরই "বায়াত নামা।" (দি মোগল ইম্পায়ার।

আকবরের ধৃষ্টতার এখানেই শেষ নয়। হুকুমনামার স্বাক্ষর আদায় করার পর তিনি একজন মুজতাহিদ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হিসেবে স্বীকৃতি পান। বোধ হয়, এই স্বীকৃতি লাভের কারণেই জুম্আর নামাযে খুত্বা পাঠের খেয়ালী ভূত তাঁর মাথায় চেপে বসে। ফলে এই ভূতই সম্রাটকে আল্লাহ্র মসজিদ ও রসূল (সঃ)-এর মিম্বরের পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য বাধ্য করে।

একদিন শুক্রবার ফতেহ্পুরের জামে মসজিদটিকে খুব সুসজ্জিত করা হয়। লোকদের অগোচরে আলেম ও ফকীহ্বেশে সেখানে এক-দল শাহী চরকে নিয়োজিত রাখা হয়। যথাসময় আজান পড়ে। একটু পরেই জুমআর নামায শুরু হবে। শাহী মিছিল এসে হাজির হ'লো। আলেম ও ফকীহ্ বেশী শাহী চরেরা মসজিদ থেকে বে'র হ'লো এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে বাদশাহকে অভ্যর্থনা করে মসজিদে নিয়ে গেল। বাদশাহর প্রতি তথাকথিত আলেম ও ফকীহ্দের এই ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে সাধারণ মুসল্লীগণেরও সম্ভ্রমবোধ জেগে উঠলো। তা' ছাড়া সেদিন মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীদের অধিকাংশই ছিল আকবরেরই নিজস্ব লোক। বিরোধিতা ও প্রতিবাদের সামান্যতম আশঙ্কাও আর নেই। রসূল (সঃ)-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে আকবর জুমআর খুত্বা করবেন। ফৈজী পূর্বেই খুত্বার জন্য ফারসী ভাষায় উদ্বোধনী শ্লোক রচনা করে রেখেছিলেন। বাঙলায় শ্লোকটির মর্মার্থ হলো,—

"প্রভু মোরে করেছেন রাজ্য অধিপতি,
দিয়েছেন জ্ঞান আর সাহস শকতি।
সত্য আর ভালবাসা দিয়েছেন বুকে,
তিনিই দিশারী মোর ন্যায়ে ভুলে চুকে।
হেন ভাষা নাই করি তাঁর গুণ গান,
আল্লাহ আকবর সেই আল্লাহ্ মহান।"

এখানে এটা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না যে, শ্লোকটির মধ্যে

আকবর আল্লাহ্‌র একজন 'অবতার' এই দাবীর সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। (মো, আ, খাঁ ঃ মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ; পৃঃ ১৩৫)

সম্রাট আকবর মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। খুত্‌বা দিতে শুরু করলেন। মসজিদে তাঁর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে বাধা দেয়ার কেউ ছিলেন না। এটা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত একটি ষড়যন্ত্র। এজন্য আগে থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি নেয়াই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্লোকের দু'টি ছত্র পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই আকবরের হৃৎকম্প আরম্ভ হ'লো। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। আকবর ভীত, চকিত ও আতঙ্কিত। মিম্বরে আর স্থির থাকা অসম্ভব। "যে, কণ্ঠস্বর যুদ্ধের তুমুল হট্টনিনাদ ছাপাইয়াও উর্ধ্বে শ্রুত হইত, এক্ষণে বালিকার কণ্ঠের ন্যায়ই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রথম তিন ছত্রের উচ্চারণ সমাপ্ত করার পূর্বেই এই সম্রাট নবীকে সেই উচ্চ মঞ্চ থেকে নামিয়া আসিতে হ'ল।" (টার্কস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৬৯)

এ কিসের ভয় ছিল ? কেন উদ্ধত কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল ? আসলে এ ছিল মহান আল্লাহ্‌রই অপার মেহেরবানি। যুগে যুগে তিনি ইসলামকে যেভাবে রক্ষা করেছেন সেইভাবে তাঁর মসজিদ ও তাঁর প্রিয় নবীর মিম্বরের পবিত্রতাও অক্ষুন্ন রেখেছেন।

আকবরের কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। কিন্তু গতি রুদ্ধ হলো না। বরং তা বেড়েই গেল। এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই তিনি আবার ওলামায়ে কেরাম ও মুজতাহিদদের কুৎসা রটনা, মর্যাদাহানী এবং তাদের সম্পর্কে অশোভন উক্তি করতে লাগলেন। দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্ভ্রমবোধ তাঁর অন্তর থেকে উঠে গেল। দরবারীরা প্রকাশ্যে দ্বীনের বিরোধিতা শুরু করলেন,—ইমাম ও মুজতাহিদেরকে গালাগালি দিতে লাগলেন। মোল্লা বদায়ুনী স্বকর্ণে শোনা কথা বর্ণনা করছেন,—

"বাহাস ও বিতর্কের সময় ইমাম ও মুজতাহিদদের কোন কথাকে পেশ করা হ'লে আবুল ফজল-এর জবাবে বলতো, অমুক হালুয়া বিক্রেতা তমুক کفش دوز এবং অমুক চামড়াওয়ালার কথা দ্বারা তোমরা আমার যুক্তি খণ্ডন করতে চাও ?"

ইরানী আলেমদের ফেত্‌না

কেবল ভারতীয় স্বার্থপর আলেমরাই আকবরী ফেত্‌না সৃষ্টি করেনি। বরং ইরান থেকে ভাগ্যান্বেষণে আগত একদল স্বার্থপর আলেমও এজন্য দায়ী ছিল।

বাদশাহ হুমায়ুন ইরানীদের সাহায্য ও সহায়তায়ই দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসন পান। এজন্য তিনি ইরানী ওলামা ও কবিদেরকে দরবারে উচ্চপদ এবং বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। আকবরের আমলেও এই নিয়ম ও রীতি অব্যাহত ছিল। শাহী দরবারে এই সম্মান ও উচ্চ পদপ্রাপ্তির খবর পেয়ে ইরান থেকে দলে দলে আলেম ও কবি দিল্লী আসতে থাকেন। মোগল বংশের পতন পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। ইরান থেকে আগত অতি সাধারণ ব্যক্তি ও দিল্লীর শাহী দরবারে উচ্চ উচ্চ পদে সমাসীন হ'তে লাগলো, মান-মর্যাদায় এখানকার সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে থাকলো।'

এই নবাগত ব্যক্তিরা শুধু ইমাম ও মুজতাহিদদের প্রতি অশোভন উক্তি করে থামলো না, বরং সাহাবায়ে কেরামদের পর্যন্ত মন্দ বলতে লাগলো। তাঁদের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণে এরা উৎসাহ ও আনন্দবোধ করতো এবং তাঁদের মিথ্যা কলংক রটনায় সর্বদা খোচ্চার এবং দোষ বর্ণনায় উচ্চকণ্ঠ ছিল। বাদশাহ আকবর ঐতিহাসিক ঘটনাবলী শুনতে খুব ভালবাসতেন। যেসব ইতিহাসগ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে তারা বেছে বেছে বাদশাহকে তা-ই কেবল শোনাতো। মোল্লা বদায়ুনী বলেছেন,—

"সাহাবীদের চরিত্র সম্বলিত গ্রন্থসমূহ পাঠের সময় সাহাবীদের সম্পর্কে বাদশাহ যেসব মন্তব্য করতেন,—বিশেষত খলীফাত্রয়ের খিলাফত, ফেদাকের হাঙ্গামা, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ, ইত্যাদির উল্লেখকালে যা বলতেন তা শোনার চাইতে কান যদি বধির হয়ে যেতো—তবেই ভাল হতো। আমি মুখে সেসব কথা উচ্চারণ করতে পারব না।"[১]

বাদশাহ ইসলামের সত্যিকার ইমাম ও মুজতাহিদদের বিরুদ্ধে ঘৃনাব্যঞ্জক অভিযোগ আনেন এবং শ্লেষাত্মক কটুক্তি করেন। ইসলামের প্রতি এছিল বাদশাহর প্রথম আঘাত। আর দ্বিতীয় আঘাতে তিনি

ইসলামের নাম-নিশানাটুকুও মুছে ফেলার প্রয়াস পান। বদায়ূনী বলছেন,—

"বাদশাহর মতে ইসলামের সকল মাযহাব অযৌক্তিক এবং (আল্লাহ্ মাফ করুন) ইসলামের প্রবর্তক ও প্রচারকরা আরবের কয়েকজন নিঃস্ব-গরীব বেদুঈন মাত্র। এরা সবাই দুষ্কৃতিকারী ও ডাকাত ছিলেন। এর প্রমাণ স্বরূপ বাদশাহ 'শাহ্‌নামার' দু'টি বিখ্যাত পদ পেশ করতেন। কবি ফেরদৌসী ইরানের শাহ্ ও আমীর-উমারাদের উক্তির নকল স্বরূপ এ পদ দু'টি রচনা করেছিলেন।"[২]

পদ দু'টির মর্মার্থ হলো ঃ

"উটের দুধ ও মল খেয়ে খেয়ে আরবদের দুঃসাহস এতই বেড়ে গিয়েছে যে, তারা এখন আরবের বাইরের দেশগুলো দখলের খাহেশ করছে। এদের মুখে থুথু!"

বাদশাহ আকবর এতটুকু করেই ক্ষান্ত হলেন না। বরং আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামের মূল পর্যন্ত উপড়ে ফেলার চেষ্টায় লেগে গেলেন। বদায়ূনী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বর্ণনা করছেন,—

"দ্বীনের প্রতিটি খুঁটি এবং ইসলামের প্রতিটি আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বাদশাহ ঠাট্টা উপহাস ও কটাক্ষ করতে লাগলেন, এবং এভাবে ইসলাম সম্বন্ধে জানারূপ দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালালেন। বাদশাহর এসব উপহাসের বস্তু শুধু দ্বীনের অঙ্গীভূত খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোই ছিল না, বরং এর মৌলিক বিষয়গুলোও ছিল। যেমন নবুয়ত, আল্লাহ্‌র ওহি, দীদারে ইলাহী, মানুষের মুকাল্লাফ হওয়া, বিশ্ব-সৃষ্টি, হাশর-নশর ইত্যাদি।"[১]

এসব ব্যাপারে শুধু বাদশাহই বিভ্রান্ত হননি। তাঁর দরবারীরাও এসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতেন। প্রত্যেকেই আপন ধারণা অনুযায়ী তাঁর ব্যাখ্যা দিতেন। মোল্লা সাহেব বলেছেন ঃ

"বাদশাহ সাধারণ মানুষের নিকট কুরআন সৃষ্টির কাহিনী সম্পর্কে প্রচার করতেন, ওহীর অসম্ভাব্যতার উপর জোর দিতেন,

১. মুন্তাখাবুত, তাওয়ারিখ, পৃঃ ৩০৮
২. ঐ পৃঃ ৩০৭

নবুয়ত ও ইমামতের মাসায়েল সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসের পরীক্ষা নিতেন এবং জ্বিন, ফিরিশ্‌তা ইত্যাদি সমগ্র অদৃশ্য সৃষ্টি, মো'জেজা ও কারামতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করতেন। কুরআন অকাট্য-ভাবে সর্বজনস্বীকৃত ও আল্লাহ্‌র কালাম হওয়াকে, দেহ ধ্বংস হওয়ার পর আত্মার বিরাজমানতা এবং সওয়াব ও আজাবকে অসম্ভব মনে করতেন। অবশ্য তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং তদানুযায়ী শাস্তিদান ও পুণ্যলাভের সমর্থক।"[৩]

এসব মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে সম্রাট আকবর মাঝে মধ্যে এমনই জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন যে, তাঁর শাহী মর্যাদা ও আত্মসম্মানের কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন। অনেক সময় তিনি আপন মর্যাদার খেলাফ করে বসতেন। কোন কোন সময় কথা বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠতেন এবং এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে যেতেন এবং অপর পা বাঁকা করে উপর দিকে তুলে রাখতেন। আর চিৎকার দিয়ে বলতে থাকতেন ঃ

"এ কথাকে বিবেক কি করে মানতে পারে যে, একজন মানুষ এই ভারী ও জড়দেহ সত্ত্বেও হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে আসমানের উপর চলে গেল এবং গোপন, রহস্যপূর্ণ ও বন্ধুসুলভ নব্বই হাজার কথাও আল্লাহ্‌র সঙ্গে বললো। আর এত সময় পর্যন্ত তাঁর বিছানাপত্র উত্তপ্তই রয়ে গেল। অথচ মানুষ তা' বিশ্বাসও করছে। তা'ছাড়া সে নাকি চন্দ্রও দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে! এসব আজগুবী কথাও লোকে মেনে নিচ্ছে।"[৪]

এরপর উপরে তুলে রাখা পায়ের দিকে সভাসদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আকবর জিজ্ঞেস করতেন ঃ

"আমার এই পা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত ওই পা যেমন ওঠানো যাবে না, তদ্রূপ সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও আমার পক্ষে 'সম্ভব' হবে না। এ-ই যদি হয় তবে বাস্তব অবস্থায় এসব আজগুবী কাহিনী বলার কি যৌক্তিকতা রয়েছে ?[৫]

---

৩. ঐ পৃঃ ৩১৭
৪. ঐ পৃঃ ৩৭৩
৫. ঐ, পৃঃ ৩১৭

আকবরের ধৃষ্টতার চরম প্রকাশ এখনো বাকী রয়ে গেছে। ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্বন্ধে "হিজরতের প্রাথমিক অবস্থায় কোরায়েশদের কাফেলা লুট করা, চৌদ্দজন মহিলাকে বিয়ে করা, এবং বিবিদের রেজামন্দীর উদ্দেশ্যে মধু হারাম করা" প্রভৃতি আপত্তিকর কথাও ব্যবহার করতেন এবং এদ্বারা নবুওয়াত সম্পর্কে আপত্তি ওঠাতেন। (নাউযুবিল্লাহ)। এরপর আকবর যা' করেছেন তা' শুনলে শরীর শিউরে ওঠে। মোল্লা বদায়ুনী বর্ণনা দিচ্ছেন,—

"আহামদ, মুহাম্মদ ও মুস্তফা প্রভৃতি নাম বহিরাগত কাফেরদের খাতিরে এবং অন্তঃপুরের নারীদের অসন্তুষ্টির কারণে এই ব্যক্তির (আকবর) নিকট অত্যন্ত অসহনীয় ছিল। কিছুদিন পর এমনকি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামও তিনি বদলিয়ে ফেলেন। যেমন, 'ইয়ার মুহাম্মদ' ও 'মুহাম্মদ' খানকে তিনি 'রহমত' নামেই ডাকতেন এবং লেখার সময়ও তাদের এই নামই লিখতেন।" মুন্তাখাব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৫)

সম্ভবত বাদশাহ আকবরের আমলে লিখিত কিতাবের সূচনায় না'ত (নবী প্রশস্তি) না লেখার এটাই ছিল একমাত্র কারণ। বাদশাহকে নাখোশ করার ইচ্ছা ও হিম্মত বোধ হয় এসব স্বার্থপর আলেমদের ছিল না। মোল্লা বদায়ুনী লিখছেন ঃ

"স্বার্থপর আলেমরা আপন আপন রচনাবলীতে 'খুত্‌বা' লেখা ছেড়ে দিতে লাগলেন, শুধু তওহীদ সম্পর্কে লেখাই যথেষ্ট মনে করলেন এবং বাদশাহী সূচক নামগুলো লিখতে লাগলেন। অমুসলিম ও অবিশ্বাসীদের সামনে আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম মুবারক উচ্চারণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"[৬]

আকবর মোল্লা বদায়ুনীকে দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করান এবং শুরুতে ভূমিকা লেখার নির্দেশ দেন। কিন্তু মোল্লা বদায়ুনী তা লিখতে অস্বীকার করেন। কেননা, তিনি জানেন, না'ত ছাড়াই তাঁকে এই ভূমিকা লিখতে হবে। অথচ এটা করতে তিনি কখনো রাজি ছিলেন না। বস্তুত আকবরের এই খেয়ালের পরিণাম অত্যন্ত

৬. ঐ পৃঃ ২২৯

মারাত্মকরূপ ধারণ করে। সাধারণ মানুষের মাঝেও এই খেয়াল সৃষ্টি হয়ে যায়। তারা সীমা লংঘন করতে থাকে। বদায়ুনী লিখছেন,—

''কয়েকজন হিন্দু এবং কিছুসংখ্যক হিন্দু ঘেঁষা দুর্ভাগা মুসলমান প্রকাশ্যে নবুওয়াত সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলো।"[১]

কিন্তু তাদের বাধা দানের কিংবা এ থেকে বিরত রাখার কেউ ছিল না। বাধা দেবে কে? যার দেয়ার ক্ষমতা ছিল, সেই আকবর তো এ ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হলেন। তখন—যখন খ্রীষ্টান মিশনারী দল তাঁর দরবারে পদার্পণ করলো। অন্যান্য কথার সঙ্গে তাঁরা প্রকাশ্য দরবারে "দাজ্জালের গুণাবলী বর্ণনা করে তা মহানবীর চরিত্রের উপর আরোপ করতে লাগলো।" (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক) এতে তাদেরকে বাধা দে'য়া তো দূরের কথা, আকবর একটু মনক্ষুণ্ণও হলেন না। বরং সহাস্য বদনে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। এবং শাহজাদা মুরাদকে পাদ্রীদের থেকে তবররক স্বরূপ কিছু শিখতে হুকুম দিলেন।

যার আকিদা বিশ্বাসের অবস্থা হ'ল এই,—তার আমল সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা বাতুলতা মাত্র। এমন একদিন গিয়েছে যখন আকবর জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন—এবং প্রকাশ্য দরবারে রীতিমত নামায আদায় করতে এবং জামায়াতের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে সবাইকে নসীহতও করতেন। তারপর? স্বয়ং মোল্লা বদায়ুনীর ভাষায়,—

"দিওয়ান খানায় প্রকাশ্যভাবে নামায আদায় করার সাহস কারো ছিল না।" কেননা—"নামায রোযা এবং হজ্জ তো তিনি অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।"[২]

শুধু যে বাদশাহ্ নিজেই ওসব পরিত্যাগ করেছেন এবং অন্যদেরকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছেন তা-ই নয়। বরং তাঁর উৎসাহ ও অনুমোদন পেয়ে মুসলিম নামধারী অনেক লোক ইসলামকে নিয়ে

১' ঐ

২. ঐ পৃঃ ২৫১।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা শুরু করে দিল। এতে সাহস পেয়ে বিধর্মীরাও প্রকাশ্যে ইসলামকে উপহাস করতে লাগলো। ইসলামের বিরোধিতায় মেতে উঠলো। সকলের জন্য তা আধুনিকতা ও বিজ্ঞতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ালো। বদায়ুনী বলছেন,—

"মোল্লা মুবারকের পুত্র আবুল ফজলের ছাত্র ইসলামের ইবাদত সম্পর্কে আপত্তি তুলে এবং তাঁকে উপহাস করে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। বাদশাহ তাঁর এই পুস্তিকাগুলো আনন্দিতচিত্তে হাতে তুলে নেন এবং এগুলো লেখার কারণে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়ে যান।"[১]

আকবরের ধর্মদ্রোহিতার ফিরিস্তি দীর্ঘ। বদায়ুনীর ভাষায় সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায়, বাদশাহ—

"নামায রোযা এবং নবুওয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর প্রতি ঈমাম পোষণের নাম দিয়েছেন 'তাকলীদ' (অন্ধ বিশ্বাস)। এসবকে তিনি অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করেছেন। আর কুরআন সুন্নাহকে বাদ দিয়ে ধর্মের বুনিয়াদ যুক্তি ও বুদ্ধির উপর রেখেছেন।"[২]

বদায়ুনী আরো জানাচ্ছেন যে, শরীয়তের কোন মাসআলা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে বাদশাহ্ বলে উঠতেন,—

"এব্যাপারে মোল্লাদের জিজ্ঞেস করো। আর বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পর্কিত কোন বিষয় হলে আমার কাছে জানতে চেয়ো।"[৩]

দরবারে পণ্ডিত পুরোহিতদের সমাবেশ

সম্রাট আকবর সকল ধর্মের প্রতি সমান মনোভাব পোষণ কর-বেন বলে দাবী করেছিলেন। ঘোষণা দিয়েছিলেন কোন ধর্মকেই অপর ধর্মের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে না। সব ধর্মের প্রতি এই উদারতা দেখানো এবং সম-অধিকার প্রদানের এই দাবী স্ব-প্রমাণের উদ্দেশ্যে তিনি সকল ধর্মের জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের দাওয়াত দেন এবং তাঁর শাহী দরবারে তাদের সমাবেশ ঘটান। এই সমাবেশে

---

১. ঐ পৃঃ ৩০৮

২. ঐ পৃঃ ২৫১।

৩. ঐ পৃঃ ২১১

তিনিও থাকতেন। আলোচনায় অংশ নিতেন। সকলের কাছ থেকে তাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনে নিতেন। মুসলমান আলেম ও হিন্দু ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা আগে থেকেই দরবারে উপস্থিত ছিল। তাই প্রথমে তাদের সাথেই ধর্মীয় আলোচনা চলতো। বিতর্কও হতো। ঠিক এমনি সময় ঘটে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন। আর তাদের সাথে আসে খ্রীষ্টান পাদ্রী-দল। একদল পাদ্রী শাহী দরবারে হাজির হয়। উপঢৌকন স্বরূপ বাদশাহকে একটি বাইবেল দেয়। বাদশাহ্ সসম্মানে তাদের দরবারে বসান। খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে বাদশাহ্র জানার আগ্রহ দেখে তারা সম্রাটকে ত্রিত্ববাদের মর্ম বোঝায়, খ্রীষ্টান ধর্মের সত্যতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা চালায়। আকবর বাইবেল বুঝতে চান। তা অনুবাদের দায়িত্ব আবুল ফজলকে দেন। আবুল ফজল বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। গ্রন্থের শুরুতে যীশু খ্রীষ্টের নাম লিখে অনুবাদ আরম্ভ করেন।

এরপর গুজরাট থেকে এসে জোটে অগ্নি-উপাসক পারসিকরা। আসে তাদের ধর্মীয় গুরুরা। তারা আকবরের সামনে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ জেন্দাবেস্তা রাখে এবং তাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম বলে দাবী জানায়। অগ্নি-উপাসনা তাদের ধর্মের একটি অঙ্গ। তারা সম্রাটকে এর মাহাত্ম্য বোঝায়। বাদশাহকে নিজেদের ধর্মের প্রতি টানতে চায়। ইরানের কায়ানী বাদশাহদের রীতি-নীতি ও আইন-কানুনের বাস্তবরূপ আকবরের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পায়। এতে অগ্নি-উপাসকদের ধর্মের প্রতি আকবরের ঝোঁক এসে যায়। তিনি এই ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং এর কোন কোন অংশকে মানতেও শুরু করে দেন। মোল্লা বদায়ূনীর ভাষায়,—

"ইরানের বাদশাহদের ন্যায় মোগল শাহীমহলে দিনরাত আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখার ব্যবস্থা করার জন্য শেখ আবুল ফজলকে নির্দেশ দান করা হয়।"—ঐ পৃঃ ৩০৮

এছাড়া হিন্দু ধর্মের সকল সম্প্রদায় এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী সকল দলের প্রতিনিধিরাই দরবারে উপস্থিত থাকতেন। প্রথমদিকে সম্রাট তাদের সকলের সাথেই আলোচনা করতেন,—সকল ধর্মের অনুসারীদের মতামত অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

কিন্তু অচিরেই "আকবরের এই ধর্মীয় নীতিতে পরিবর্তন ঘটে, তার ধর্মীয় সহনশীলতা উঠে যায় এবং তাঁর আসল স্বরূপ প্রকাশ পায়। বদায়ূনীর কথার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছায় যে,—

"ইসলামের উচ্ছেদ মানসে ইসলামের বিপরীত অন্যানা ধর্মের প্রত্যেক হুকুমকেই অকাট্য দলিল বলে মেনে নেয়া হতো—আর ইসলামের সকল কথাকেই অনর্থ অযৌক্তিক, নতুন সৃষ্টি এবং আরবের নিঃস্ব ও গরীব লোকদের বানাওট বলে মনে করা হতো।"—ঐ, পৃ ৩০৮

এজন্য পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান-অনুশীলন থেকে ইসলামকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়। মনে করা হয় এর, সবই মিথ্যা ও ভিত্তি-হীন—এতে অনুসন্ধানের কিছুই নেই। পরিণাম এই দাঁড়ায়,—

"মুসলমানদের ছাড়া অন্য যার যে কথাই পছন্দ হতো—তা-ই গৃহীত হতো। আর যা' পসন্দ হতো না এবং বাদশাহর মনোভাবের বিপরীত হতো—তা' থেকে বিরত থাকা ও তা' পরিহার করাকে নিতান্ত জরুরী মনে করা হতো।"—ঐ, পৃঃ ২৫৬

"পাঁচ ছ বছর পর ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করলো।"—ঐ, পৃঃ ২৫৫

এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, আকবরের ধর্মীয় সমতা, উদারতা ও সহনশীলতার দাবী সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো এবং এক চোখা ও সংকীর্ণতার রূপ ধারণ করলো। কেউ বাদশাহর বিশ্বাসের বিপরীত আচরণ করলে বাদশাহর নিকট সে পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত হতো। বস্তুত, এখন এই নিয়ম নির্ধারণ করে দেয়া হলো যে, ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সকল ধর্মেরই মূলনীতি এবং খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। পরে বিবেক বুদ্ধি যা যুক্তিসিদ্ধ হবে তা-ই প্রাধান্য লাভ করবে এবং সে অনুযায়ীই কার্জ চলবে। এজন্য আকবর তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকদের নিয়ে চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁরা সকলে যেন একত্রিত হয়ে বসেন, যে যা' জানেন তা' প্রকাশ করেন এবং সব বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী কমিটির বৈঠক বসতো, তাতে সকল মাসয়ালা পেশ করা হতো এবং যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। এছাড়া

এই কমিটির আরও একটি বিশেষত্ব ছিল। বদায়ূনীর ভাষায় তা হলো,—

("ইসলামী আমল আকিদা সম্বন্ধে) হাসি-ঠাট্টা ও উপহাসচ্ছলে বিভিন্ন রকমের সন্দেহ সৃষ্টি করা হতো—কেউ এর জবাব দিতে চাইলে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হতো।"—ঐ পৃঃ ১৬৯

মূলত আকবর এভাবে ইসলামকে একটি নিষিদ্ধ বৃক্ষে পরিণত করে দিয়েছিলেন। এর ফল খাওয়া তো দূরের কথা এর নিকটবর্তী হওয়াও জঘন্য অপরাধ ছিল। ইসলামের পরিভাষা এবং বিধি-বিধানকে চিরতরে খতম করে দেয়ার সকল অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। আর সেস্থলে প্রবর্তন করা হয়েছিল আল্লাহ্‌হীন ধর্ম দ্বীন-ই-ইলাহীকে। আকবর তাঁর এই নতুন ধর্মে খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে ঘন্টা বাজানো, ত্রিত্ববাদের ধারণা এবং অনুরূপভাবে ক্রিড়া-কৌতুকের বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেছিলেন। এসবই তার জপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

আকবর পারসিকদের থেকে ধার করেছিলেন জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ডের উপাসনার পদ্ধতি। তিনি পণ্ডিত আবুল ফজলকে দিয়ে শাহী মহলে একটি অগ্নি-কুণ্ডের ব্যবস্থা করিয়ে নেন। এটি সারা দিনরাত প্রজ্জ্বলিত থাকতো। আকবর প্রকাশ্যভাবে এর পূজা করতেন। মোমবাতি ও প্রদীপ জ্বালানোর সময় আগুনের প্রতি সম্মান দেখাতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকেরাও অনুরূপ সম্মান দেখানো নিজেদের উপর বাধ্যতা-মূলক করে নিয়েছিলেন। আকবর খ্রীষ্টান ও পারসিকদের ধর্ম থেকে যা' গ্রহণ করেছিলেন—এ হলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশী যে ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন, যে ধর্মের রীতি-নীতি বেশী গ্রহণ করেছিলেন এবং নতুন ধর্ম প্রচারে যে ধর্মের কাছে বেশী ঋণী ছিলেন সে ধর্মটি ছিল 'হিন্দু ধর্ম'। এই ধর্মের পণ্ডিত, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণরা আকবরের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নেন। তাঁরা দলে দলে এসে শাহী দরবারে জমায়েত হন। বাদশাহ তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং দরবারে উচ্চাসন দান করেন। "বাল্যকাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন জাতি যেমন—ব্রাহ্মণ, ভাট এবং অনুরূপ অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাদশাহর বিশেষ সম্পর্ক এবং অশেষ হৃদ্যতা ছিল। এছাড়া সম্রাট আকবর বহু হিন্দু রাজকন্যাকে

হেরেমে প্রধান বেগমের মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলেন। মুসলমান বেগমের তুলনায় এঁদের প্রতিই সম্রাটের অনুরাগ বেশী ছিল। হিন্দু মহিষীরাও এই সুযোগে স্বীয় ও জাতীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্য অনেক প্রভাব খাটান। হেরেমে হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি চালু করতে সমর্থ হন।

মহেশ দাস ওরফে বীরবল আকবরের নব-রত্নের একরত্ন ছিল। মালিক-উশ-শোয়ারা (কবি সম্রাট) তাঁর উপাধি ছিল। বাদশাহর মানস-রাজ্যে সে-ই সবচাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। আকবর ও বীরবলের সম্পর্ক আজো সর্বত্র সমানভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই বীরবলের সুপারিশক্রমেই দেবী নামে জনৈক দার্শনিক আকবরের ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য লাভ করেন। আকবর তাঁকে নানাভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন। এই ব্রাহ্মণের প্রভাব আকবরের উপর এত বেশী ছিল যে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বাদশাহ সব সময় উদ্বিগ্ন ও উন্মুখ থাকতেন। এমন কি রাত্রে পর্যন্ত তিনি হেরেমে আকবরের বিশ্রামস্থলে অবাধে চলে যেতেন। সেখানে তাঁর আরোহণের জন্য আকবর লিফ্‌টের ন্যায় দোলনার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত্রে সময় হওয়া মাত্র ব্রাহ্মণ তাতে গিয়ে বসতেন। এরপর ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁকে উপরে টেনে ওঠানো হতো। বদায়ুনী লিখছেন,—

"দেবী ব্রাহ্মণ মহাভারতের কাহিনী বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁকে দোলনায় বসিয়ে উপরে উঠিয়ে শাহী প্রাসাদের বাদশাহর বিশ্রামস্থলে বরাবর লটকিয়ে রাখা হতো। আর এই ঝুলে থাকা অবস্থায় তাঁর থেকে বাদশাহ ভারতীয় প্রাচীন কাহিনী, এর রহস্য, মূর্তি, সূর্য ও অগ্নি-উপাসনার পন্থা, নক্ষত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম, হিন্দুদের মহাপুরুষ যেমন, ব্রহ্ম, মহাদেব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, মহামায়া প্রভৃতির প্রতি শিষ্টাচারের পদ্ধতিগুলো শুনতেন, এসব দেব-দেবীর প্রতি আগ্রহী হতেন এবং তাদেরকে মেনে নিতেন।"—ঐ পৃঃ ২৮৮

এ ছাড়া অন্যান্য ব্রাহ্মণরাও আকবরের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ফলে এদের আকিদা বিশ্বাস, সংস্কার এবং রসম-রেওয়াজই আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীতে বেশী স্থান পেয়েছিল।

অনরূপভাবে হিন্দু ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণেই আকবর

আপন বিবাহিত মুসলিম বেগমের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং জয়পুরের হিন্দু রাজা বিহারী মল্লের কন্যাকে মহিষীর মর্যাদা দেন। অন্তঃপুরের মুসলমান বেগমদের ইসলামী ধর্মকর্ম করার ও আচার অনুষ্ঠান পালনের কোনই অধিকার ছিল না। অথচ তিনি তাঁর হিন্দু মহিষীদের-কে মূর্তিপূজার ও অন্যান্য হিন্দুয়ানী আচার-অনুষ্ঠান পালনের সকল সুবিধাই দিয়ে রেখেছিলেন। আকবর স্বয়ং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষরমালা পরে চন্দনচর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে দরবারে উপস্থিত হতে শুরু করলেন। দরবারের হিন্দু পণ্ডিত ও পুরোহিতরা সম্রাটকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা" সম্বোধনে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করতে লাগলেন। এমন কি চণ্ডী দেবীর বন্দনা করতে গিয়েও হিন্দু কবি গাইলেন,

> হেথা একদেশ আছে নামে পঞ্চগৌড়।
> সেখানে রাজত্ব করে বাদশাহ আকবর ॥
> অর্জুনের অবতার তিনি মহামতি।
> বীরত্বে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি ॥
> ত্রেতা যুগে রাম হেন অতি সযতনে।
> এই কলি যুগে ভূপ পালে প্রজাগণে ॥"[১]

হিন্দুদের এসব তোষামোদ চাটুকারিতায় আকবর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আর হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

ধ্বংস অভিযান শুরু

আকবর যে সময় দ্বীন-ই-ইলাহী ধর্ম প্রচারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সে সময় ইরানে এক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে। শিয়া মতাবলম্বী শাহ নিহত হন এবং সুন্নী শাহ তখতে বসেন (১৫৭৫ খৃঃ)। এই সময় ইসলাম বিরোধী "মুলহেদ" নামে একটি ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায় ইরানে

১. চণ্ডী মাধবাচার্য্য কর্তৃক ১৫৭৭ খ্রীঃ রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৩৭২

বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এরা দলে দলে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের শিক্ষা আকবরের মতবাদের অনুরূপ হওয়ায় তারা শাহী দরবারে সাদরে গৃহীত হয় এবং এই সম্প্রদায়ের নেতাগণ ধর্মীয় ব্যাপারে বাদশাহর গোপন উপদেষ্টা মনোনীত হয়।[১]

এই উপদেষ্টারা আকবরকে কি পরামর্শ দিয়েছিল—এবং আকবরকে দিয়ে কি কাজ সাধন করিয়ে নিয়েছিল মাওলানা আকরম খাঁ তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন,—

"শিয়া সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে তাঁহাদের দ্বাদশ ইমাম আল-হাসান-আল-আসকারীর পুত্র মোহাম্মাদ বা ইমামুল মেহদীকে হিজরী ২০৬ সনে (তাঁর পিতার দাফন কার্যের সময়) শেষ বারের মত সাধারণ্যে দেখা যায়। প্রচলিত বিশ্বাস মতে সহস্র বছর পূর্ণ হইলে তাঁহার পুনরাবির্ভাবের কথা ছিল। আকবরের নবাগত এই উপদেষ্টাগণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, হিজরী অব্দের এক সহস্র বছর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, এই শুভ মুহূর্তে তিনি (আকবর) যদি নিজেকে সেই লুক্কাইত ইমাম বা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'মেহদী' বলে ঘোষণা করেন তাহা হইলে একই সঙ্গে তাঁহার সকল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইবে।"

রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে সম্রাট আকবর সেই সময় এমনি ধরনের একটা কিছু করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই এরূপ একটা সুবর্ণ সুযোগ তিনি হাতছাড়া হইতে দিলেন না।"[২]

এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় মোল্লা বদায়ূনীর ইতিহাস 'মুন্তাখাবুত্তাওয়ারীখে'। তিনি বলছেন,—

"বাদশাহ স্বকপোলকল্পিত ধারণায় এই সিদ্ধান্ত ঠিক করে বসে

---

১. হিস্টরী অব ন্যাশনালিজম পৃঃ ৩১

২. মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস পৃঃ ১৩২

রয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রবর্তিত দ্বীনের পূর্ণ হায়াত এক হাজার বছর ছিল, যা পূর্ণ হয়ে গেছে। এতদিন বাদশাহর অন্তরে যেসব গোপন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল এরপর তা' প্রকাশ ও ঘোষণা করতে এখন আর কোন বাধাই রইল না। অপর দিকে যেসব পীর মাশায়েখ ও ওলামার কিছুটা প্রভাব ও ভয় ছিল—তাঁদের পৃষ্ঠপোষক বাদশাহ আর করছেন না। সুতরাং অবাধে উদার মনে তিনি ইসলামের বিধি-বিধানগুলো বাতিলকরণে লেগে গেলেন। নিত্য-নতুন বিধি-বিধানের জন্ম দিতে লাগলেন। এ সবই অর্থহীন, ভ্রান্ত ও বুদ্ধি বর্জিত বিধি-বিধান ছিল। এতে আকিদা বিশ্বাসে বিপর্যয় দেখা দিল।" পৃঃ ৩০৯

আকবরের ধারণায় ইসলামের হাজার বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। এরপর ইসলাম অচল হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন তাঁরই যুগ শুরু হয়েছে। সে যুগে মুদ্রাই একমাত্র প্রচারের বড়ো মাধ্যম ছিল। আকবরও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। হাজারকে আরবীতে বলা হয় 'আল্‌ফ'। এজন্য তিনি তাঁর মুদ্রার নাম রাখেন 'সেক্কা-ই-আলফী।' আকবর মুদ্রার মধ্যে 'আল্‌ফ'-এর তারিখ মুদ্রণের নির্দেশ দান করেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর তংকা আশরাফীর মধ্যে 'আলফ'-এর তারিখ মুদ্রিত হয়। এটা করে আকবর এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দ্বীনের বয়স এক হাজার বছর ছিল—আর তা শেষ হয়ে গেছে।

আকবরের ধারণা হলো তিনি যতদিন জীবিত আছেন ততদিনই তাঁর মুদ্রা ও মতবাদ চালু থাকা সম্ভব। এরপর তা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এই মতবাদকে স্থায়ী করার জন্য তিনি লিখালেন "তারীখে আলফী।" এটি একটি ইতিহাসগ্রন্থ। সম্রাটের আদেশে কয়েকজন আলেম তা রচনা করেন। এর রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বদায়ুনী মন্তব্য করছেন,—

"ওই বছর এই হুকুম হয় যে, এখন হিজরতের হাজার বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং মানুষ সর্বত্র হিজরী সন ও তারিখ লিখে থাকে। তাই এখন নতুন করে একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করা

নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ইসলামে যত সুলতান অতীত হয়েছেন, সবার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে। এটি অপরাপর সকল ইতিহাসগ্রন্থকে বাতিল করার ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। এই ইতিহাসের নাম 'আলফী' রাখা হোক। বাদশাহ এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, সন-তারিখ উল্লেখ করার সময় 'হিজরত'-এর স্থলে 'রেহলত' (মৃত্যু) শব্দ লিখতে হবে।"

কেননা তাঁর ধারণায় তখন ইসলামের মৃত্যু ঘটেছে। তাই তিনি 'রেহলত' লিখার নির্দেশ দিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)।

ইসলাম সম্পর্কে এই ছিল সম্রাট আকবরের মনোভঙ্গি। কিন্তু তাঁর এই বিরূপ মনোভাব ও মিথ্যা দাবীর সমর্থনে স্বার্থপর আলেমরা এগিয়ে আসে এবং এর স্বপক্ষে বহু দলীল-প্রমাণ পেশ করে। ফলে স্বীয় মতে এই মূর্খ সম্রাটের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। মোল্লা বদায়ুনী লিখছেন,—

"ওই বছর নীচু শ্রেণীর কয়েকজন হীন প্রকৃতির লোক—যাঁরা পণ্ডিতরূপী মূর্খ ছিল—তাঁরা এই দাবীর সমর্থনে বাতিল ও মিথ্যা দলীলের একটি স্তূপ সৃষ্টি করলো। বললো বর্তমানে জাহাঁপনাই একমাত্র যুগের নায়ক, তিনিই শুধু হিন্দু মুসলিমের বাহাত্তর ফেরকার মধ্যকার মতবিরোধ ও ঝগড়া মিমাংসা করে দিতে পারেন।"[১]

অথচ এই মূর্খের দলের স্মরণ নেই যে, যে হাদীসে নবী করিম (সঃ) বাহাত্তর ফেরকার কথা বলেছেন—সেখানে 'উম্মতি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ বাহাত্তর ফেরকা তাদের মধ্যে হবে; যাঁরা ইসলামের দাবী করে। এতে হিন্দুদের জড়িত করা চরম বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবাদী হওয়ার দাবীদার সম্রাট স্বচ্ছন্দে এই অযৌক্তিক ব্যাখ্যাটা মেনে নিলেন এবং এই পথে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মিটিয়ে ফেলার কাজে লেগে গেলেন। জ্ঞানী হিন্দুরা যখন এই বিরোধ মেটানোর স্বরূপ দেখতে পেলেন, তখন তাঁরা এ ব্যাপারে সম্রাটের সহায়তার জন্য আরো বেশী বেশী করে এগিয়ে এলেন। কারণ, তাঁরা দেখলেন এবং বুঝলেন, এই বিরোধ মেটানোর অর্থ হলো,—ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও হুকুম-আহকামকে

---

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ পৃঃ ৩৭৯

সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দেয়া আর তাঁদের ধর্মের সকল রীতি-নীতি ও অনুশাসনকে মেনে নেয়া। সুতরাং এই সুযোগ হাতছাড়া করতে কোন্ বোকা চাইবে? তাই এই বোকামী তাঁরা করলেন না।

বদায়ূনী বলছেন,—

"ব্রাহ্মণরা নিজেরা হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখে তা প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত ও আচার্য্যদের রচিত বলে বাদশাহর খেদমতে পেশ করতেন। এগুলোর মর্মার্থ এই হতো যে, ভারতে একজন বিশ্বজয়ী বাদশাহ জন্ম নেবেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাবেন, গো-রক্ষা করবেন এবং সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দের প্রতি ইনসাফের দৃষ্টি রাখবেন। তাঁরা পুরানো কাগজে এসব ধ্বংসাত্মক কথা লিখে বাদশাহকে দেখাতেন। বাদশাহও তা সত্য বলে মনে করতেন।"[১]

বস্তুত স্বার্থপর আলেম, 'মুলহেদ' সম্প্রদায় এবং চাটুকার হিন্দুদের প্রভাবে সম্রাট আকবর বিভ্রান্ত হলেন এবং দ্বীন-ই-ইলাহীর প্রচার শুরু করলেন। আর এই নব-প্রবর্তিত ধর্মের ভিত্তি মোটামুটি হিন্দু ধর্মের উপরই রাখলেন।

আকবর সর্বপ্রথম স্বীয় প্রচারিত ধর্ম অনুযায়ী নিজেই আমল শুরু করেন। এই আমল তাঁর মাকে দিয়েই আরম্ভ হয়। আকবরের মা মরিয়ম মাকরানীর মৃত্যুর পর তিনি যে শোক প্রকাশ করেন তা প্রায় হিন্দুদের শোক প্রকাশের মতই ছিল। বদায়ূনী বলছেন,

"বাদশা মাথার চুল, দাড়ী ও গোঁফ কামিয়ে শোক প্রকাশক বস্ত্র পরিধান করলেন। বাদশার অনুকরণ করে কয়েক হাজার আমীর-উমারা এবং মনসবদারও নিজস্ব চুল, দাড়ি ও গোঁফ কামিয়ে ফেলেন।"

বদায়ূনীর বর্ণনায় আকবরের চিন্তাধারা উদ্দেশ্য এবং ঝোঁক-প্রবণতা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা গেল। শেখ আবুল ফজল ও ফৈজী এবং তাদের পিতা মোল্লা মুবারক নাগোরী আকবরের বিশিষ্ট মুরীদ ছিলেন। এরাই সর্বপ্রথম আকবরের নব-প্রবর্তিত ধর্ম দ্বীন-ই-ইলাহীর

---

১. ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৬

২ ঐ পৃঃ ২০৩

উপর ঈমান এনেছিলেন। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য ঘোষিত নীতি ও শিক্ষা অনুযায়ী এবং নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালনের চারটি স্তরও (মাল-বর্জন, জান-বর্জন, ইজ্জত-বর্জন ও দ্বীন-বর্জন) অতিক্রম করেছিলেন।

'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরীতে শেখ আবুল ফজলও এই নব-প্রবর্তিত ধর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। তিনি দরবারের নব-রত্নের এক রত্ন, সম্রাটের বিশিষ্ট উপদেষ্টা, ঘনিষ্ঠ সহচর এবং সার্বক্ষণিক বন্ধু ছিলেন। বাদশাহর গোপন ও আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। সুতরাং আকবরের চিন্তাশীল, মানসিকতা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আমরা সঠিক বলে মনে করতে পারি।

জাহাঙ্গীর শুধু যুবরাজ এবং সিংহাসনের উত্তরাধীকারীই ছিলেন না। একজন ঐতিহাসিক ও নিবন্ধকারও ছিলেন। তিনি তাঁর আত্ম-জীবনী লিখে গেছেন। এতে আকবর সম্বন্ধে অনেক বর্ণনাও দিয়েছেন। স্থানে স্থানে আকবরকে "মাজাজী (কৃত্রিম) খোদা এবং খাঁটি মুর্শেদ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। আত্ম-জীবনীতে এই খাঁটি মুর্শেদের চরিত্রের কয়েকটা দিক তিনি তুলে ধরেছেন ঃ

"আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের উত্তম গুনাবলী প্রশংসার উর্ধ্বে, বর্ণনা ও ধারণার বাইরে। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বাদ দিলেও সত্যি কথা এই যে, তাঁর আকর্ষণীয় চারিত্রিক গুণাবলী সম্বন্ধে যদি কোন স্থায়ী গ্রন্থ রচনাও করা হয়—তবু এর সামান্যতম অংশও লেখার আওতায় আসবে না। পিতা বিশাল সাম্রাজ্য, অসীম ও অগণিত ধন-সম্পদ, অসংখ্য হাতী, আরবী ও তুর্কী ঘোড়ার মালিক হওয়া সত্ত্বেও দরগাহে-ইলাহীতে সর্বদা বিনয়ী ও নত হওয়া থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে তিনি নিকৃষ্টতম বলে মনে করতেন এবং মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকতেন না।"[১]

পুত্র পিতা সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি করা ছাড়া আর কি-ই বা বলবেন।

---

১. জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী, পৃষ্ঠা ১৭।

অথচ সমসাময়িক ইতিহাস থেকে আমরা জানি আকবর তাঁর নব উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী সূর্যের পূজা ও কাল্পনিক দেবতার ধ্যান করতেন এবং তাঁর নামও জপতেন। স্বয়ং জাহাঙ্গীরের রচনায়ও এ মানসিকতা ও ঝোঁক-প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর বলছেন—

"আমার পিতা অধিকাংশ সময় প্রত্যেক ধর্ম ও মাযহাবের জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সাথে,—বিশেষ করে জ্ঞানী এবং হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে থাকতেন। তিনি অশিক্ষিত ছিলেন সত্য—কিন্তু জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে অধিক ওঠা-বসা ও মেলা-মেশা করতেন, এই কারণে তাঁর কথাবার্তায় কারো পক্ষেই এটা বুঝা সম্ভব ছিল না যে, তিনি উম্মী (অশিক্ষিত) ছিলেন। গদ্য ও পদ্যের এসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রহস্য ও গূঢ়তত্ত্ব পর্যন্ত তিনি পৌঁছে যেতেন, যার অধিক পৌঁছা সম্ভব ছিল না।"[১]

এরপর তিনি আকবরের ধর্মীয় উদারতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেছেন। তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতা তথা ধর্মনিরপেক্ষতা রূপী ধর্মহীনতার বর্ণনা,—

"শিয়াদের জন্য ছিল পারস্য। আর সুন্নীদের জন্যে ছিল রোম, ভারত ও তুরান। আশ্রয়স্থল হিসেবে সবার জন্যে এ ছিল নির্দিষ্ট। কিন্তু দুনিয়ার সকল দেশের ব্যতিক্রম ছিল তুলনাহীন এই বিশাল সাম্রাজ্যের অবস্থা। এখানে বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের জন্যে যেমন ছিল সমান অধিকার তেমনি ছিল আশা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

যেভাবে দয়াময় আল্লাহ্‌র বিশাল দুনিয়া সকল গোষ্ঠি, জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের জন্য আশ্রয় বিদ্যমান। সেভাবে আর "আকবর" এর বিরাট সাম্রাজ্যের আওতায়ও (যার সীমা শোর নদীর তীর ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত), সকল মিল্লাত সত্যে ভ্রান্তিতে পতিত আবার বিশ্বাসীদের জন্য আশ্রয় ছিল। এখানে একে অন্যকে কষ্ট দেয়া ও ক্ষতি করার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। এটা এজন্যে যে, ছায়া তো মূল সত্তার অবশ্যই প্রতিভূ হবে। সুন্নী শিয়াদের সঙ্গে এক মসজিদে ফিরিঙ্গী ইহুদীদের সঙ্গে একই গির্জায় ইবাদত ও উপাসনার অনুষ্ঠান সমাধা করতো। তার

১. ঐ পৃ-১৫

নির্দিষ্টকৃত সর্ব ধর্মের সন্ধির মূলনীতি ছিল এই—প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেক দ্বীন ও আইনের সৎ এবং পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাথে তিনি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। পরিস্থিতি ও বুদ্ধি অনুযায়ী প্রত্যেকের প্রতি সুদৃষ্টি দান করতেন। তিনি বিনিদ্র রজনী কাটাতেন এবং দিনে খুব কমই শুতেন। রাত-দিনে অর্ধ-প্রহরের বেশী ঘুমাতেন না। রাত্রিক্ষয় যাওয়া জাগরণকে ফিরে পাওয়া সম্পদ বলে মনে করতেন।

আকবরের কৃচ্ছ্র সাধনা সম্বন্ধেও জাহাঙ্গীর বর্ণনা দিচ্ছেন—

"আমার পিতা যে কৃচ্ছ্র সাধনা করেছেন, তার মধ্যে একটি ছিলো এই যে; 'পশুর গোশত' খাওয়া তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন, সারা বছরে তিনি মাত্র তিন মাস গোশ্তের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতেন। বাকী নয় মাস অন্যান্য রকমের 'সুফিয়ানা খাদ্য' খেয়েই তুষ্টি লাভ করতেন। পশু হত্যা এবং জবেহ করাকে তিনি কখনও পসন্দ করতেন না। তাঁর গৌরবময় আমলে বছরে অনেক মাস এবং মাসে অনেক দিন পশু হত্যা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আকবর নামায় এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।"[১]

পূর্বে মুসলমান কাজীরাও হিন্দুদের মামলা মোকদ্দমার বিচার করতে পারতেন। কিন্তু ১৫৮৭ সালে আকবর এক ফরমান জারী করে এটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং হিন্দুদের বিচারের ভার হিন্দু বিচার-পতিদের হাতেই ছেড়ে দেন।

মূলত আকবরের আমলের পূর্ব পর্যন্ত যেসব শক্তি প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলিম জাতির ধবংস সাধনে লিপ্ত ছিল,—সেসব শক্তি আকবরের পূর্ণ সমর্থন লাভ করলো, প্রচুর সম্মান ও সমাদরের সাথে তাঁরা দরবারে গৃহীত হলো এবং সম্রাটের উৎসাহ পেয়ে এই হীন অপকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আকবর খ্রীষ্টান, পারসিক ও হিন্দু মান-সিকতাকে জীবন-ধারায় প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে পূর্ণশক্তিতে আত্ম-নিয়োগ করলেন। তাঁর এই ধর্মনীতির যে দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তার একটি হলো—ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতি, শিক্ষা ও

১. জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী পৃঃ ১৮
২. ঐ পৃঃ ২২

রীতি-নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং অপরটি হলো খ্রীস্টান, পারসিক ও হিন্দু মতবাদ ও চিন্তাধারার সমন্বয়ে দ্বীন-ই-ইলাহীর ন্যায় প্রকৃত পূজাভিত্তিক একটি নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু হিন্দু মানসিকতার যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি মনে করেছেন হিন্দুরা এতে তাঁর উপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছে। অথচ তাদের এই বাহ্যিক তোষামোদ ও চাটুকারিতা ছিল স্বার্থসিদ্ধির কূটকৌশল মাত্র। তাঁর নজীর আমরা পাই হিন্দুদের দ্বীন-ই-ইলাহী গ্রহণ না করার মধ্যে। আকবর তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি মানসিংহকে দ্বীন-ই-ইলাহীতে দীক্ষিত হওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাটের এমন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সেনাপতিটিও জওয়াবে বলেছিলেন,—

"যদি জীবন উৎসর্গ করার সংকল্পই হয় মহামান্য সম্রাটের মতবাদ গ্রহণের একমাত্র অর্থ, তাহা হইলে আমার ধারণা, আমি যে সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী তাহার প্রমাণ আমি যথেষ্টই দিয়াছি। কিন্তু আমি একজন হিন্দু সম্রাট আমাকে মুসলমান হইতেও বলিতেছেন না। আমি তৃতীয় কোন ধর্মের কথা অবগত নহি।"[১]

তাঁর নব-রত্নের অন্যতম রত্ন রাজা টোডরমলও দ্বীন-ই-ইলাহী গ্রহণ করেননি। এভাবে আকবর তাঁর বিশ্বস্ত সহচর ও দরবারী হিন্দুদের পর্যন্ত তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করতে পারেননি।—অথচ এদের উপর সম্রাটের অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হয়েছিল অকাতরে। আর অন্যদের কথা তো আলাদা।

বস্তুত আকবর ভারতে মোগল বংশের রাজত্ব চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই এই নব ধর্ম দ্বীন-ই-ইলাহীর ভিত্তি নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন এবং ভারতের তদানীন্তন দুর্ধর্ষ সামরিক জাতি—পাঠান শক্তির ধ্বংস সাধন করেন। অথচ এর স্থলে আর একটি মুসলিম সামরিক জাতি গড়ে তুলতে এতটুকু সচেষ্ট হননি। বরং বৈরাম খান, আহসান খান, মোয়াজ্জম খান প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মুসলিম সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের সকল ভবিষ্যৎ সম্ভবনাকেও অংকুরেই বিনষ্ট করে দেন। আকবর এখানেই ক্ষান্ত হননি, বরং জনৈক ইউরোপীয় লেখকের

১. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ; পৃঃ ১৩৭

ভাষায়, "বহিরাগত বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও নানা দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইল। সম্রাট জন্মসূত্রের সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া মাত্র ২২ বছর বয়ঃক্রমকালে আপন নিয়তি ও তাঁর বুকের দানবটির সহিত নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখতে পেলেন।"[১]

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, আকবর যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে নব-ধর্মের প্রবর্তন করেন, সে উদ্দেশ্য সাধনে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হয়েছেন। কারণ বিদেশাগত যে উদীয়মান খৃষ্টান শক্তি এবং দেশের অভ্যন্তরের ক্রমবর্ধমান হিন্দু শক্তির সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষ আশঙ্কা করে খৃষ্টান ও হিন্দুদের সন্তুষ্টি লাভের আশায় তিনি দুর্ধর্ষ পাঠান সামরিক শক্তির ধ্বংস সাধন করেছিলেন—ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির বিরোধিতায় মত্ত হয়েছিলেন এবং খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয়ে দ্বীন-ই-ইলাহীর প্রচার চালিয়েছিলেন, পরিণামে এই শক্তি দ্বয়ের হাতেই মোগল বংশ ধ্বংস হয়েছিল, ভারতে ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিনাশ ও দারুণ দুর্দশা ঘটেছিল। ইসলাম, মুসলিম জাতি ও মোগল বংশের দুর্যোগের দিনে যে ইসলামী স্পিরিট জাতির পুনরভ্যুদয় ঘটাতো, যে মুসলিম সামরিক শক্তি কাজে আসতো—আকবর আর সব শক্তি এবং প্রতিভাকেই সমূলে বিনাশ করে ছেড়েছেন এবং ইসলাম, মুসলিম জাতি ও মোগল বংশের প্রধান শত্রু খৃষ্টান ও হিন্দুদেরকে শক্তি অর্জনের সর্বপ্রকার সুযোগ করে দিয়েছেন। পরিণামে এই হিন্দু ও খৃষ্টান শক্তির হাতেই এদেশে ইসলামের দারুণ সর্বনাশ হয়েছে, মুসলিম জাতির চরম বিপর্যয় ঘটেছে এবং মোগল বংশ ধ্বংস হয়েছে,—আর দেশবাসী দু'শো বছর যাবৎ গোলামী জীবন যাপন করেছে। এজন্য আকবরের বিচক্ষণতার অভাব, অদূরদর্শিতা বিভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং তাঁর অনুসৃত ধ্বংসাত্মক নীতিই একমাত্র দায়ী ছিল। অথচ তাঁর এটা জানা উচিত ছিল যে তেলে পানিতে কখনো মেলে না। বিপরীত ধর্মী ও পরস্পরবিরোধী দু'টি শক্তি কখনো একে অন্যের মিত্র হ'তে পারে না। সাময়িক ছল চাতুরীর আশ্রয় হয়তো কেউ নিতে পারে। কিন্তু সুযোগ পেলেই একে অন্যের ধ্বংস সাধনে মেতে ওঠে। আকবর যদি এ না করে সারা

---

[১] তার্কস ইন ইণ্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৬০

ভারতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং মুসলিম জাতির উন্নতি ও মুসলিম সামরিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করে যেতেন এবং সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে পার্লামেন্টারী শাসন জারী করতেন আর মোগল বংশের জন্য বাদশাহী তথা রাষ্ট্রপ্রধানের আসন নির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক করে যেতেন—তা হ'লে হয়তো বৃটেনের রাজা-রানীর ন্যায় ভারতবর্ষে আজো মোগল বংশের বাদশাহী কায়েম থাকতো, মুসলমানরা সারা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হতে পারতো।

আকবরের মৃত্যু

আকবরের জন্ম ১৫৪২ খৃস্টাব্দে। তিনি সিংহাসনে বসেন ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে এবং ১৬০৬ খৃস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। আবুল ফজল ও বদায়ূনী দু'জন আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক। দু'জনই তাঁর মৃত্যুর অনেক আগেই ইন্তেকাল করেন। আবুল ফজল বারো বছর পূর্বে নিহত হন এবং বদায়ূনী দশ বছর পূর্বে পরলোক গমন করেন। আকবরের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও নীতি সর্বদা পরিবর্তনশীল ছিল। কিন্তু এই দু'জন ঐতিহাসিকের মৃত্যুর কারণে,—জীবনের শেষ দশ বছরে আকবরের ধর্মীয় মতবাদ ও চিন্তা-ধারায় কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল—তার বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, আকবরের জীবনের শেষ দশ বছর খুব সুখের হয়নি। বিভিন্ন শোকাবহ ঘটনা, হত্যাকাণ্ড এবং জীবনের বৃহত্তম স্বপ্ন বাস্তবায়নে চরম ব্যর্থতা তাঁর জীবনকে দুঃখময় করে তুলেছিল। ইসলামের প্রতি আজীবন বিরোধিতা ও বৈরিতার দরুণ গভীর আত্ম-গ্লানি ও অনুশোচনায় এই সময় আকবর বিশেষভাবে দগ্ধীভূত হ'তে থাকেন।

মাওলানা আকরম খাঁর ভাষায়

"মাতুল পক্ষীয় আত্মীয়স্বজনের রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আকবরের বিরুদ্ধে পুত্র জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহ ঘোষণা, জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্তৃক তাঁর আবাল্য বন্ধু, দার্শনিক ও উপদেষ্টা আবুল ফজলের নিষ্ঠুর হত্যা, তাঁহার দ্বীন-ই-এলাহী ধর্মে দীক্ষিত

একমাত্র হিন্দু রাজা মহেশ দাস বা বীরবলের আফগানদের হস্তে শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যুবরণ, টোডরমল ও অন্যান্যদের তিরোধান এবং এমনি ধরনের কতিপয় দুর্ঘটনা জীবনের শেষ দিনগুলিতে আকবরের মনের সকল শান্তি হরণ করে নেয় এবং তাঁহার জীবনকে অত্যন্ত দুঃখময় করে তোলে।"[১]

তাছাড়া আকবরের জীবনের একমাত্র বাসনা ও সাধনা ছিল তাঁর স্বকপোলকল্পিত ও নব প্রবর্তিত ধর্ম দ্বীন-ই-ইলাহীকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তিনি আপন পৈতৃক ধর্ম ইসলামকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির পূর্ণ বিরোধিতা করেছিলেন, এবং ইসলামবিরোধীদের শক্তি বাড়িয়েছিলেন। জীবনের এই বৃহত্তম স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত না হওয়ায় তিনি মনে দারুণ আঘাত পান। এটাই ছিল তাঁর জীবনের চরম বিপর্যয় ও ব্যর্থতা—জীবনের মহা ট্র্যাজেডী। এজন্য জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আকবর খুবই অনুতপ্ত হন এবং ইসলামের দিকে ফিরে আসেন বলেও কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন। মেজর প্রাইসকৃত "জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী"র ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে যে,—

"শাহিনশা আকবর সবচেয়ে বড় মৌলভীর হাতে তওবা করেন; এবং কালেমা পড়ে জান্নাতী মুসলমানদের ন্যায় এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।"

এ সম্পর্কে শামসুল মৌলভী মুহাম্মদ জাকাউল্লাহ, দেহলভী মরহুম তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ 'তারীখ-ই-হিন্দুস্তান'-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করা যাচ্ছে:

'জাহাঙ্গীর স্বীয় আত্ম-জীবনীতে পিতার মৃত্যুকালীন অবস্থাকে খুব আকর্ষণীয় ভাবে লিখেছেন। বলছেন,—৮ই জমাদিউলউলা রোজ মঙ্গলবার আমার পিতা ও মুর্শেদের শ্বাস-প্রশ্বাস ছোট্ট হয়ে আসে এবং তা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাঁর চিরবিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসে। তিনি আমাকে বললেন—"বাবা কাউকে পাঠিয়ে আমার সকল আমীর-উমরা ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে ডাকিয়ে আনো,

---

১. মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৩৬

তাদেরকে হত্যা করা হয়। হায় আক্ষেপ! হায় দুঃখ!! হায় মসিবত!!! মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ্ব-পালকের প্রিয় বন্ধু। তাঁর প্রতি ঈমান পোষণকারী অপদস্ত ও নির্যাতিত। আর তাঁর অস্বীকারকারীদের প্রতি দেখানো হয় সম্মান। তারাই বিশ্বাসভাজন। মুসলমানরা ক্ষুন্ন মনে ও ভগ্নহৃদয়ে ইসলামের খিদমত করে যাচ্ছে। অথচ কাফেররা মুসলমানদের উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তাদের কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দিচ্ছে।"

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব মুসলমানদের এই ক্ষতস্থানে লবন ছিটানোর বাস্তব নমুনা পেশ করছেন অন্য এক পত্রে, —

"ভারতের কাফেররা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে মসজিদগুলো ধ্বংস করছে, —আর সে স্থলে নিজেদের মন্দির গড়ে তুলছে। থানেশ্বরে কুরুক্ষেত্রের হাওজের পার্শ্বে একটি মসজিদ ও কবরস্তান ছিল। জনৈক কাফের তা ধ্বংস করে তদস্থলে খুব উঁচু চূড়া বিশিষ্ট একটি মন্দির নির্মাণ করে। তা ছাড়া কাফেররা প্রকাশ্যে কাফেরী আচার-অনুষ্ঠান আদায় করেছে। অথচ মুসলমানরা ইসলামের অধিকাংশ হুকুম আহকাম জারী করতে সক্ষম হচ্ছে না।"[২]

মুসলমানদের এই অসহায় অবস্থার আরও বিবরণ দিচ্ছেন মুজাদ্দিদ সাহেব,

"একাদশীর দিন হিন্দুরা খানা-পিনা বন্ধ রেখে উপবাস-ব্রত পালন করে। এই দিন মুসলিম শহরগুলোতে কোন মুসলমান যেন দিনের বেলায় কোন খাদ্য রন্ধন করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ পবিত্র রমজান মাসে প্রকাশ্যে ও সর্বসমক্ষে রুটি ও খাদ্য তৈরী করা হয়, এবং বিক্রি করা হয়। কোন মুসলমান তাদের অসায়তার কারণে এতে বাধা দিতে পারে না। আফসোস লাখো আফসোস।"[৩]

স্বার্থপর আলেমদের হীন ও ঘৃণ্য আচরণ দর্শনে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব ভীষনভাবে বেদনাহত হন। তাদের এই জঘন্য ও ধ্বংসাত্মক

---

১. মাকতুবাত ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৫ চিঠি নং ৪৭

২. মাকতুবাত পৃঃ ১৬২ পত্র নং ৯২

৩. ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬, পত্র নং ৭২

অপকর্মের সমালোচনা করেও হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব কয়েকখানা পত্র লিখেছিলেন। তাতে সে যুগের স্বার্থপর আলেমদের আসল রূপটি বাস্তবে ফুটে উঠেছে। মুজাদ্দিদ সাহেব লিখছেন—

"সারা দুনিয়া বেদাতের সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে। এবং বেদাতের অন্ধকারে আরাম ভোগ করছে। এমন বুকের পাটা কার আছে যে, বেদাতের বিরোধিতায় একটু কিছু বলা এবং সুন্নাতকে জিন্দা করার জন্য মুখ খোলে? এযুগের অধিকাংশ আলেমই বেদা'ত চালু করছে, প্রসার ঘটাচ্ছে এবং সুন্নাতকে উৎখাত করে ফেলছে।"[১]

অপর একটি পত্রে তিনি এক মজার ঘটনা বর্ণনা করেছেন,—

"এক বন্ধু অভিশপ্ত শয়তানকে দেখলো যে, সে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে এবং মানুষকে ধোকা প্রবঞ্চনা দেয়া ও গোমরাহ করা থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছে। সেই বন্ধু এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। অভিশপ্ত শয়তান জওয়াব দিল, এ জামানার স্বার্থপর আলেমরা স্বয়ং একাজে আমার যথেষ্ট সাহায্য করেছে তারাই এই সমস্যা থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জমানায় ধর্মীয় নির্দেশাবলী পালনে যে অনীহা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং দ্বীন ও মিল্লাতের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে—স্বার্থপর আলেমদের দুর্ভাগ্যজনক অধঃপতন এবং তাদের স্বার্থপরতাই তার মূল কারণ।"[২]

আকবরের ধ্বংসাত্মক নীতি ও ধর্মীয় অনাচারের অশুভ পরিণাম জাহাঙ্গীরের আমলে জীবনের সকল স্তরে প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলনও এ সময়েই চূড়ান্ত রূপ লাভ করে—তাই জাহাঙ্গীরের আমল সম্বন্ধেও বিস্তারিত জানা অবশ্য প্রয়োজন।

---

১. ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৩, পত্র নং ৫৪

২. মাকতুবাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭, পত্র নং ৩৩

সম্রাট জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর ৯৭৭ হিজরী সনে ফতেপুর সিক্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ৩৮ বছর বয়সে ১০২৪ হিজরী সনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

আল্লাহ্ প্রকৃতগতভাবেই জাহাঙ্গীরকে কর্মক্ষমতা এবং যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি যেভাবে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার প্রয়াসী ছিলেন তেমনি জনসাধারণের আরাম-আয়েশ সন্তুষ্টি ও সমৃদ্ধিরও প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি জনদরদী বাদশাহ ছিলেন। জাহাঙ্গীর বলে থাকতেন যে, বন-জঙ্গলের হিংস্র জন্তু, কীট-পতঙ্গ এবং আকাশে উড্ডীয়মান পাখীদের হেফাজত করাও বাদশাহর অবশ্যকর্তব্য। আত্ম-জীবনীতে জাহাঙ্গীর লেখেন,—

"সিংহাসনে আরোহণের পর আমার পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম নির্দেশ জারী হয়, যে, ন্যায় বিচারের শিকল টানানো হোক, উদ্দেশ্য আদালতের বিচারকরা মজলুম ও নির্যাতিত জনগণের বিচার করতে যদি অনীহা দেখান এবং অবহেলা করেন কিংবা অপারগ হন—তবে মজলুম জনগণ যেন এই শিকলের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অবহিত করতে পারে।

"এরই সঙ্গে সঙ্গে আমি বারোটি হুকুম জারী করি যেন এসব নির্দেশ শাসনতান্ত্রিক বিধানের মর্যাদা পায় এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে এর উপর আমল করা হয়।

১. প্রদেশ ও কমিশনারসমূহের জায়গীরদারগণ নিজেদের স্বার্থে তমগা ও মীর বহরী প্রভৃতি যেসব কর নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তা নিষিদ্ধ করা হলো।

২. যে সব সড়কে নিত্য চুরি-ডাকাতী হয়ে থাকে এবং যেসব সড়ক লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত ঐসব সড়কের উপর মসজিদ, সরাইখানা নির্মান এবং কূপ খনন করতে হবে। তাহলে এসব সড়কের উপর জনবসতি গড়ে উঠবে তাছাড়া সড়কের উপর সওদাগরদের বিনা অনুমতিতে তাদের মাল-সামান খোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হল।

৩. সাম্রাজ্যে বসবাসকারী কাফের অথবা মুসলমান যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পদ তার ওয়ারিশদেরকে দিতে হবে। কেউ এতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আর যদি তার কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে তার পরিত্যাক্ত সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষনের জন্য স্থায়ীভাবে একজন তহবিলদার নিয়োগ করতে হবে। মসজিদ ও সরাই-খানা নির্মাণ, ভগ্ন সেতু মেরামত, পুকুর ও কূপ খননের কাজে—অর্থাৎ শরীয়ত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

৪. শরাব প্রভৃতি অর্থাৎ শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন কোন প্রকার মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করা যাবে না আর তা বিক্রি করাও চলবে না। আমি নিজে অবশ্য শরাব পান করে থাকি। তবে আমার আঠার বছর বয়স থেকে বর্তমানে এই আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কখনো আমি নেশাগ্রস্ত হইনি। প্রথম প্রথম শরাবের প্রতি আমার খুবই লোভ ছিল। কখনো কখনো দো-জ্বালা শরাবের বিশ পিয়ালা পর্যন্ত পান করে ফেলতাম। এর পর যখন আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শক্তির উপর এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম —তখন আমি এর পরিমাণ কমানোর প্রতি নজর দিলাম। সাত বছরের মধ্যেই পনর পিয়ালার স্থলে পাঁচ-ছ পিয়ালায় চলে এলাম। বিভিন্ন সময়ে তা পান করতাম। পরে শুধু এজন' রাত্রির সময় নির্দিষ্ট করলাম। বর্তমানে একমাত্র খাদ্য হজমের জন্যই বাধ্য হয়ে কিছুটা পান করি।

৫. কারো গৃহকে নিবাস বানানো যাবে না। (সেনাবাহিনী কিংবা সরকারী কর্মচারীগণ সফরকালে মানুষের গৃহকে খালি করিয়ে নিত এবং তাতে অবস্থান করতো। বিশেষত বর্ষার মওসুমে সাধা-রণভাবে এটা করা হতো, বাদশাহ তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।)

৬. শাস্তি প্রদানকালে কোন ব্যক্তি কোন দোষীর নাক-কান কাটতে পারবে না। আমিও আমার আল্লাহ্‌র সামনে শপথ করছি যে, আমিও কাউকে অনুরূপ শাস্তি দিব না।

৭. মুতাসাদ্দিয়ানে খালেসা (متصدیان خالصہ) এবং কোন জায়গীরদারই প্রজাদের ভূমিতে স্বয়ং কৃষি করতে পারবে না।

৮. শাহী ভূ-সম্পত্তির কোন কর্মচারী কিংবা কোন জায়গীর-দার সরকারের বিনা অনুমতিতে তার অধীনস্থ কোন পরিবারেই বিয়ে করতে পারবে না।

৯. শহরগুলোতে হাসপাতাল নির্মাণ করতে হবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার শাহী জায়গীরই বহন করবে।

১০. শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ সাহেবের পন্থা অনুযায়ী আমিও নির্দেশ দিচ্ছি যে, আমার জন্মদিন অর্থাৎ ১৮ই রবিউল আউয়াল এবং প্রতি সপ্তাহে দু'দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও রোবরার কোন পশু জবেহ্ করা চলবে না। বৃহস্পতিবার হলো আমার সিংহাসনারোণের দিন এবং রোববার হলো আমার পিতার জন্মদিন।

১১. আমার বুজর্গ পিতার আমলে যার যে পদমর্যাদা নির্দিষ্ট ছিল—নির্ধারিত ছিল তা সবই যথারীতি বহাল থাকবে। সরকারী বৃত্তি সাম্রাজ্যের ইমামদের নিকট যে শাহী ফরমান রয়েছে—সে অনুযায়ী তাদের পোষ্যদের সাহায্যদান অব্যাহত থাকবে। এরা দোয়ার বাহিনী। মীরান সদর জাহান ভারতের খাঁটি সৈয়দ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। আমার বুজর্গ পিতার আমল থেকে তিনি অতি সম্মানীয় 'সদর'-এর পদে আসীন আছেন। তাঁকে আমি নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, যেন তিনি সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে প্রতিদিন আমার সামনে পেশ করেন।

১২. দীর্ঘকাল ধরে যেসব দোষী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েদখানায় বন্দী হয়ে আছে—অবিলম্বে তাদের যেন মুক্তি দেয়া হয়।"[১]

জাহাঙ্গীর আকবরের পুত্র এবং মুরীদও বটে। সুতরাং আকবরের মানসিকতা ও চিন্তাধারা জাহাঙ্গীরের প্রকৃতির মধ্যেও নিহিত ছিল। আকবরের ন্যায় তিনিও সূর্যকে 'নাইয়ারে আ'জম' (সমগ্র বিশ্ব উজ্জীবনকারী) বলতেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। জ্যোতিষদের প্রতি তিনি আস্থাবান ছিলেন। সব গুরুত্বপূর্ণ কাজেই জাহাঙ্গীর জ্যোতিষদের পরামর্শ চাইতেন। তারা গননা করে যেসময় ও দিন নির্দিষ্ট করে দিত—শুভাশুভ বিচার করে সে অনুযায়ী সম্রাট কাজে যাত্রা করতেন। তিনি নক্ষত্ররাজিকে প্রভাবশালী বলে

১. জাহাঙ্গীরের আত্ম-কাহিনী, পৃঃ ৫

জানতেন, আল্লাহ্‌র নূরের প্রকাশ বলে মানতেন, এজন্য এদের সম্মান করা জরুরী মনে করতেন এবং এ শিক্ষা অন্যদেরও দিতেন।

জাহাঙ্গীরের ধর্মীয় দৃষ্টিকোনও পিতারই অনুরূপ ছিল। পিতার ন্যায় তিনিও এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী চলতেন, ধর্মের বিরোধিতাও করতেন। আকবরের অনুকরণ করে জাহাঙ্গীর অন্যদের মুরিদ করতেন—তাদেরকে আধ্যাত্মিক সবক দিতেন। আত্ম-জীবনীতে জাহাঙ্গীর মুরিদদের নির্দেশ দিচ্ছেন,—

"কোন ধর্মের শত্রুতা করে নিজের সময়কে কলুষিত করো না। সকল ধর্মালম্বীদের ব্যাপারে "সর্ব ধর্মের সাথে আপোষ"—এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখো। যুদ্ধ ও শিকারের সময় ছাড়া কখনো কোন পশুহত্যা করো না। ... ... নক্ষত্রপুঞ্জ আল্লাহ্‌র নূরের প্রকাশ মাত্র। প্রত্যেকটির মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করো। সকল ঘটনা ও অবস্থায় আল্লাহ্‌কেই প্রকৃত প্রভাবশালী বলে জেনো। বরং নির্জন ও পরিজনে, একাকীত্ব ও সম্মেলনে তাঁরই ধ্যানে থেকো, এবং এই চেষ্টা করো, একটি মুহূর্তও যেন তাঁর স্মরণ ও ধ্যান থেকে বাদ না পড়ে।" (ঐ পৃঃ— ২৯)

এই 'সর্বধর্মে' আপোষ নীতির কারণেই জাহাঙ্গীর মুসলমান দরবেশ-দের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পোষণ করতেন হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের ঠিক অনুরূপ মনোভাব নিয়েই মিলতেন। তিনি অগ্নিকে আল্লাহ্‌র নূর মনে করতেন। এর প্রতি সম্মানও দেখাতেন হিন্দুদের দশাহরা, দীপালী প্রভৃতি পর্ব উপলক্ষে রাজধানীতে খুব ধুম-ধাড়াক্কার সাথে উৎসব অনুষ্ঠিত হত। ব্রাহ্মণরা তাঁর বাহুতে রাখী বেঁধে দিত।

আকবর সারা বছরে মাত্র তিন মাস গোশত খেতেন। জাহাঙ্গীর এতটুকু না করলেও সপ্তাহে দু'দিন গরু জবেহ আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মায়াবিনী প্রেম কাহিনী ঃ

মোগল সম্রাটগণের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। সেটি একমাত্র তাঁর জীবনের একটি মনোরম ও আকর্ষণীয় ঘটনার জন্য। আর তা হলো মায়াবিনী নূরজাহানের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও পরিণয়।

নুরজাহানের পূর্বনাম মেহের-উন-নিসা। একদিন নওরোজ উৎসবে যুবরাজ সেলিম ও রূপসী-মেহেরের সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়ের জানাজানি এবং হৃদয়ের টানাটানি এ থেকেই শুরু হয়। প্রণয় গাঢ়তর হয়। মাঝপথে বাদ সাধেন সম্রাট আকবর। ছিটকে পড়েন দু'জন দু'দিকে। মেহের-উন্-নিসার বিয়ে হয় শের আফগানের সাথে। সেলিম অতি কষ্টে প্রবোধ দেন মনকে। এরি মধ্যে আকবরের মৃত্যু হয়। যুবরাজ সেলিম হন সম্রাট, নামধারণ করেন জাহাঙ্গীর। সাম্রাজ্য শাসনে মন দেন। নুরজাহানের কথা ভুলেই যান। শের আফগানকে গবর্ণর করে পাঠান সুদূর বাঙ্গাল মুল্লুকে। অকৃতজ্ঞ শের আফগান বিদ্রোহ ঘোষনা করেন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে। তাঁকে দমনের জন্য জাহাঙ্গীর কুতুবুদ্দীন খাঁকে বাংলায় পাঠান। প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে। শের মারা যান। মেহেরউ-ন-নিসা বিধবা হন এবং দিল্লীতে চলে আসেন। চার বছর তাঁর বৈধব্য বেশে কাটে। ঘটনাচক্রে জাহাঙ্গীরের সাথে তাঁর দেখা হয়ে যায়। সুপ্ত প্রেম জেগে ওঠে। পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। মেহের-উন-নিসা নুরজাহান হয়ে যান। জাহাঙ্গীরের চোখের জ্যোতি এবং দেহ ও মনের মনিব হয়ে বসেন। স্বয়ং জাহাঙ্গীর স্বীকার করেছেন,—

"বর্তমানে আমার হুকুমত ও সুলতানাত এই শিকলে আবদ্ধ।"

জাহাঙ্গীরের সেক্রেটারী মো'তামেদ খাঁ বলছেন,—

"ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছয় যে, বাদশাহীর নামটি শুধু অবশিষ্ট থাকে। সম্রাট প্রায়ই বলতেন—'আমি নুরজাহানকে আমার বাদশাহী দান করে ফেলেছি। এখন এক সের শরাব এবং আধা সের গোশ্ত ছাড়া আমি আর কিছু চাই না।" (ভূমিকা জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী)

নুরজাহান আপন যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতা গুণে সম্রাটকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলেন। জাহাঙ্গীরও তাঁর হাতে সকল ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে কাল যাপন করতে থাকেন, বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। কিন্তু বুদ্ধিমতি নুরজাহান এই সুযোগে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে লিপ্ত হন। এজন্যে অনেক ধ্বংসাত্মক কাজও তিনি করে বসেন। যদ্দরুণ মহবত খাঁর ন্যায় একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সেনাপতিও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নুরজাহানের স্বার্থের চক্রান্তে

সম্রাট তঁর প্রিয় পুত্র শাহজাহানের প্রধানতম শত্রুতে পরিণত হন। শহ-জাহান পিতার ভুল ভাঙাতে বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নুর-জাহানের চক্রান্তই জয়ী হয় পিতা-পুত্রে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে নুরজা-হানের ভ্রাতা আসফ খাঁ আপন জামাতা শাহজাহানের পক্ষ নেন এবং নুরজাহানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

নুরজাহান শিয়া ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইরান ছিল শিয়া ধর্মের কেন্দ্র। এসময় শিয়া-সুন্নী ঝগড়া চরম আকার ধারণ করেছিল। কেননা, তখন সুন্নী তুর্কীদের সঙ্গে ইরানীদের নিত্য যুদ্ধ সংঘটিত হতো। এতে স্বভাবত প্রত্যেকেই আপন মতাবলম্বীদের পক্ষ নিত।

জুমআর খোত্‌বায় খোলাফায়ে রাশেদীনের উল্লেখ সে সময়ের সবচেয়ে বড়ো বিতর্কিত বিষয় ছিল। ইরান, দাক্ষিনাত্যের আদিল শাহী ও অন্যান্য শিয়া মতাবলম্বী সুলতানরা খোতবায় 'খোলাফায়ে রাশে-দীনেররা' এই নামোল্লেখের বিরোধী ছিলেন। ইরানে সময়ে সুন্নীদেরকে বলপূর্বক শিয়া মতে বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করা হতো।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর অসিয়ত করে গিয়েছেন যে, মোগল বংশের কোন সম্রাটই যেন অনুরূপ বিতর্কিত বিষয়ে কখনো জড়িত না হন। বরং সর্বদা এর উর্ধ্বে থেকে সকল জাতিকেই যেন সমদৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু সম্রাজ্ঞী নুরজাহান তা হতে দিলেন না। হয়তো বা এর মধ্যে ইরানী কূটনৈতিক চাল কাজ করেছিল। কেননা, ভারতে ইরানীদের সহায়তায়ই দ্বিতীয়বার মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ইরানী শাসকবর্গ চেয়েছিলেন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এবং ভারতের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখতে। তা হলে আফগানদের থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে তুর্কীদের সাথে তাদের যুদ্ধ চালানো সম্ভব ও সুবিধা হবে। আর নুরজাহানের ন্যায় বুদ্ধি-মতি মহিলা ভারতের সম্রাজ্ঞী হলে এবং সম্রাটের উপর তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হলেই এই সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে বড়ো সফলতা এখানেই। সম্রাজ্ঞী নুরজাহানকে দিয়ে ইরানের শাহ অনুরূপ আরো বহু উদ্দেশ্য অনায়াসেই সাধন করিয়ে নিয়েছেন। অথচ এই পন্থায় না হলে লাখো জীবনের বিনিময়েও এই কাজ সম্ভব হত না।

জাহাঙ্গীরের উপর নূরজাহানের আর কূটনৈতিক বিজয় হলো, নূরুল্লাহ্ শুস্তীর চীফ জাস্টিসের পদ লাভ করা। নূরুল্লাহ শুস্ত্রী শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর প্রধান কাজীর পদ পাওয়ার অর্থ হলো, বিচার বিভাগের উপর শিয়াদের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়া। এটা ছিল সুন্নীদের জব্দ করার একটি বড়ো হাতিয়ার।

বস্তুতঃ আকবর যে বিষবৃক্ষটি রোপণ করে গিয়েছিলেন তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্রুত নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটিয়েছিল এবং মুসলমানদের সামাজিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের সকল স্তরে যে ব্যাপক ভাঙন ধরিয়েছিল—তার পূর্ণ চিকিৎসা আজো হয়নি। এখানে আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করছি ঃ

১. "১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় আগমন করেন ………যথেষ্ট খাতির যত্ন করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লওয়া হয়। সম্রাট (জাহাঙ্গীর) তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে গ্রহণ করেন, তাঁহাকে খেতাব ও বৃত্তিদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিবাহ করিলে ও ভারতে বসতি স্থাপনে রাজী থাকিলে তাঁহার সহিত শাহী মহলের একজন শ্বেতাঙ্গ তরুণীকে বিবাহ দানের প্রস্তাব করেন।" (মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস পৃ-৯৩৮)

২. "খৃষ্টানদের প্রতি তাঁর (জাহাঙ্গীরের) সৌজন্যের মাত্রা এতদূর গড়াইয়াছিল যে শাহী পরিবারের কয়েকজন শাহজাদা পর্যন্ত আগ্রার গীর্জায় প্রকাশ্যে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন হকিন্সের নেতৃত্বে পরিচালিত স্থানীয় খ্রীস্টান বাসিন্দা পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী পরিবৃত্ত হইয়া মিছিল করিয়া গীর্জায় গমন করিয়াছিলেন।" (ঐ, মোছলেম বঙ্গের ইতিহাস - কীনি ও কেঞ্চ)

৩. "তিনি (জাহাঙ্গীর) রাত্রি কালেই তাহার বন্ধু সমাজকে লইয়া মদের নেশায় মাতিয়া উঠিতেন। শাহী মহলে ইউরোপের সকল জাতির লোকদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি এই ইউরোপীয়দের সহিত ভোর রাত্রি পর্যন্ত সুরা পানে মত্ত থাকিতেন।" (ঐ ঃ কাট্রুন)

৪. মানসিংহ যেভাবে তেজস্বিতা ও বীরত্বসহকারে দ্বীন-ই-ইলাহী কবুলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, শেখ আব্দুন্নবী ও মওলানা

মাখদুমুল মুলকের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা এবং শাহীদরবারের অন্যান্য মুসলিম সভাসদরা পর্যন্ত অনুরূপ বীরত্ব দেখাতে পারেননি। বরং তাঁরা সবাই আকবরের বয়ান নামায় স্বাক্ষর দান করেছিলেন। নওরোজ উৎসব উপলক্ষে আকবর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মুসলিম ধর্মনেতা ও আলেমদেরকে সুরাপানের আমন্ত্রণ জানালে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁরা সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে মুসলিম লেখকরা হিন্দী ভাষায় হিন্দু ধর্মের ভাব ও আদর্শ সম্বলিত বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'মদন শতক' 'সামুদ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থও এর মধ্যে রয়েছে। এসব গ্রন্থের সূচনায় লেখকরা গনেশ, রামচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু দেবতার বন্দনা গেয়েছেন, 'রামভূষণ' গ্রন্থের প্রণেতা ইয়াকুব খান, রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতী ও গৌরী শঙ্করের স্তুতি কীর্তন করেছেন এবং এসব দেব-দেবীর প্রতি পুজা নিবেদন করে ধর্মীয় উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

৫. আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে মুসলমানরা সালামের পরিবর্তে বাদশাহকে নতজানু হয়ে সিজদা করতো। কেউ না করতে চাইলে তাকে এজন্য বাধ্য করা হতো। আইনত গরু জবেহ নিষিদ্ধ ছিল। বহু অনৈসলামিক আইন ও ফরমান মেনে চলতে মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হতো। মসজিদের কোন দায়িত্বই যেন সরকারের ছিল না। ফলে বহু মসজিদ ভেঙে পড়ে বিরান হয়ে যায়। হিন্দুরা বহু মসজিদ ধ্বংস করে সে সকলকে মন্দির ও নাট্যশালায় রূপান্তরিত করে। জাহাঙ্গীরের সমকালীন বিজাপুরের মসজিদগুলো সম্পর্কে ফিরিশতা লিখছেন—"তারা (হিন্দুরা) মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে মূর্তি পুজা করতো এবং বাদ্যযন্ত্র সহযোগে দেব-দেবীর স্তুতি বন্দনার গান গাইতো।"[১]

৬. পুর্বে মুসলিম রাজা-বাদশাহদের আমলে প্রচলিত মুদ্রায় আল্লাহ্ রসুল কিংবা কালেমা অঙ্কিত থাকতো। আকবর সর্বপ্রথম এই রীতি বাতিল করে দেন এবং অগ্নি-উপাসকদের মধ্যে প্রচলিত সৌর বছরের নাম অঙ্কনের প্রথা জারী করেন। জাহাঙ্গীর এক্ষেত্রে আরো এক ডিগ্রী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এই নির্দেশ দেন যে,

১. কনফেডারেসী অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫১

"মুদ্রা প্রস্তুতকালে সূর্য যে রাশিচক্রে অবস্থান করবে, (মুদ্রায়) সেই রাশি-চক্র মুদ্রিত হবে।"

৭. ইউরোপীয় খৃস্টান বণিকের দল প্রথমত বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যেই ভারতে আগমন করে। এরপর তাদের ধর্মপ্রচারের জন্য এদেশকে উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করে খৃস্টান মিশনারীদেরকেও নিয়ে আসে। কিন্তু অচিরেই তারা সবাই দেশীয় রাজ দরবারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। এসব দর-বারে তারা খুব প্রশ্রয় পায়। দেশের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব তাদের তীব্র হয়ে ওঠে। তারা দেশ দখলের মতলব আঁটতে থাকে। মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবর বহু পূর্বেই শুরু করে দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর একাজটিকে আরো ত্বরান্বিত করে তোলেন। তিনি স্যার টমাস রো ও তার মূল পুরোহিত অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত চতুর কূটনীতিবিদ রেভারেণ্ড ই. ফেবিকে বিশেষ প্রশ্রয় দেন। তাঁরা কুমতলব হাসিলের জন্য সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

আকবরের আমলে ইংরেজরা সুরাট বন্দরে নিজদেরকে সুদৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। স্যার টমাস রো তিন বছর জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত থাকেন। তিনি বহু চেষ্টা-তদবিরের পর দরবার থেকে নিজেদের সকল দাবী-দাওয়া ও আরজি মঞ্জুর করিয়ে নিতে সক্ষম হন। এর ফলে ইংরেজরা অন্যায়ভাবে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যান এবং সুরাটের কারখানাটিকে একটি শক্তিশালী দুর্গ ও সৈন্যশিবিরে রূপান্তরিত করে তোলেন। এ সম্পর্কে 'এন-সাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকা'য় বলা হয়েছে,—

"মূল ভূ-খণ্ডের যে স্থানটিতে ইংরেজরা প্রথম কারখানা স্থাপন করিয়া ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বীজ বপন করে, নগরীটি সেই স্থানেই অবস্থিত। শাহী মঞ্জুরীর শর্ত অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শুধু মাত্র সুরাটেই নয়, মোগল সাম্রাজ্যের বহু কেন্দ্রে কারখানা স্থাপনের অনুমতি করিয়াছিলেন। টমাস রো'র ভারত ত্যাগকালে সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ ও ব্রুচে ইংরেজদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

এই সমস্ত কারখানার কর্তৃত্ব সুরাট কারখানার প্রধান কর্মকর্তার হস্তে ন্যস্ত করা হয়েছিল। উক্ত কর্মকর্তা কারখানা পরিচালনা ছাড়াও পারস্যের লোহিত সাগর উপকুলস্থিত বন্দর সমূহের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন।"[১]

৮. এ সময় যেসব লোক বাইরে থেকে ভারতে আসে তাদের মধ্যে ইরানী ও খোরাসানীদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। আসার সময় তারা শুধু নিজেরাই এদেশে আসেনি। সাথে করে ইরানী ও খোরাসানী বিশ্বাস মতবাদ ও চারিত্রিক চাল-চলনও সাথে করে নিয়ে আসে। আর এ দেশী যেসব লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তারাও সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও তরবিয়তের অভাবে বহু জাহেলী এবং হিন্দুয়ানী চাল-চলন আচার-আচরণকে আঁকড়ে থাকে। এই বিদেশগত ও স্বদেশী মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা এবং আচার-আচরণ সমন্বয়ে ইসলাম এক অভিনব রূপ লাভ করে। এতে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও সংস্কৃতি, ইসলামী চিন্তাধারা ও রীতি-নীতির সঙ্গে শেরক ও কুফরের সংযোগও ঘটে, বর্ণ, বংশ এবং শ্রেণীপার্থক্যও স্থান পায়, হিন্দুয়ানী রীতি-নীতি অনুপ্রবেশ করে। এসব কিছু মিলিতভাবে এক নতুন শরিয়তের জন্ম দেয়। স্বার্থপর আলেম ও পীররা এই নতুন শরিয়তের পুরোহিত বনে যান। মানুষদের কাছ থেকে তাঁরা হাদিয়া, তোহফা ও নজরানা পেতেন—আর মানুষদের তাঁরা জেরকাবন্দীর পুরস্কার দিতেন। তাছাড়া তথাকথিত পীরদের হাতে সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী এক ধরনের সুফীবাদেরও জন্ম হয়।

বস্তুতঃ ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন-ধারায় ইসলামবিরোধী এমন এক প্লাবন দেখা দেয় যে, তখনি একজন মুজাদ্দিদের আগমন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায়ই হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী শেখ আহমদ সারহিন্দী (রঃ)-এর জন্ম হয় (৯৫৬৩ ১৬২৪ খৃঃ)। তাঁর শিক্ষা ও তারবিয়ত এমন লোকদের হাতে সমাধা হয় যারা সে যুগের অন্যতম বুজর্গ আল্লাহভীরু ও পুণ্যবান আলেম ছিলেন। বিশেষত সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী, অধ্যাত্ম জগতের নেতা হযরত বাকীবিল্লাহ (রঃ)-এর নিকট থেকে তিনি আধ্যাত্মিক সবক হাসিল

১. টেক্সট বুক অব মর্ডান ইণ্ডিয়া হিস্টরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭

করেন। মুজাদ্দিদ সাহেবের বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা ও প্রখর মেধার পরিচয় পেয়ে হজরত বাকীবিল্লাহ (রঃ) এতই আনন্দিত হন যে, শেখ সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি এক বন্ধু-সমীপে এই পত্র লেখেন, —

"অধুনা সারহিন্দ থেকে শেখ আহমদ নামে এক ব্যক্তি এসেছেন। গভীর জ্ঞানের অধিকারী, শক্তিধর আমলকারী। কয়েকদিন এই অধমের সাথেই তার ওঠা-বসা হয়েছে। এই সময় তাঁর অবস্থা যা পর্যবেক্ষণ করা গেছে তাঁর ভিত্তিতে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে সে এমন এক দীপ-শিখায় পরিণত হবে, বিশ্বকে যা আলোকোদ্ভাসিত করবে।"

হজরত বাকীবিল্লাহ (রঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী কালে সত্যে পরিণত হয়েছে। ইসলামের পূর্ববর্ণিত এই দুর্দিনেই শেখ আহমদ সারহিন্দী (রঃ) সংস্কার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আকবরের শাসনের শেষাংশেই তিনি সংগ্রাম আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং সংকটময় পরিস্থিতি থেকে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করেছেন।

শেখ সাহেবের সাধনা ছিল যেমন বিরাট ও বিপুল, তেমনি ব্যাপক ও সর্বতোমুখী। সে সময় নিষ্ঠাবান, আল্লাহ ভীরু অযোগ্য আলেম এবং পীর যে একেবারেই ছিলেন না—তা নয়। বরং ছিলেন অনেকেই, তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কমও ছিল না। কিন্তু তাঁরা মাদ্রাসাগুলোর চার-দেয়ালের মধ্যে মসজিদ খানকাহ ও নৈতিক আচার আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনা অধ্যাপনাতেই ব্যস্ত ছিলেন। পথকেই তাঁরা নিজেদের ঈমান রক্ষা করার একমাত্র ব্যবস্থা বলে মনে করতেন। কিন্তু মুজাদ্দিদ সাহেবের কর্মধারা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি এসব আলেম ও সুফীগণের ন্যায় বাদশাহর রাজনৈতিক অনাচার এবং দরবারের স্বার্থপর আলেমদের ব্যভিচার দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। আত্মগোপন করেও থাকেননি। তিনি সব অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, ঝাঁপিয়ে পড়েন কঠোর সংগ্রামে। তিনি জানেন,—

ان من اعظم الجهاد كلمة حق (او عدل) عند سلطان جائر- (ترمذى)

অর্থাৎ "অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায্য কথা প্রকাশ করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।"—(তিরমিজী)

তাঁর এই সংগ্রাম কোন ব্যক্তি, শ্রেণী কিংবা মাযহাব বিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না। তাঁর সংগ্রাম ছিল সবরকম অধর্মের বিরুদ্ধে, প্রত্যেক অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং সকল জালেম ও অনাচারীর বিরুদ্ধে। এতে তিনি কারা-প্রকোষ্ঠ এবং ফাঁসী কাষ্ঠের ভয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। কোন ভয়ই তাঁর গতিরোধ করতে পারেনি। ফলে শুরু হয়ে যায় বিশ্বের চিরাচরিত রীতি-অনুযায়ী কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত। এই কায়েমী স্বার্থবাদী দলে ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহী দরবার এবং দরবারী আলেম সমাজ। তাঁরা এক যোগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরুদ্ধে। জাহাঙ্গীর আন্দোলনের কৈফিয়ৎ দানের জন্য মুজাদ্দিদ সাহেবকে দরবারে তলব করেন। মুজাদ্দিদ সাহেব দরবারে হাজির হন। কিন্তু দরবারের প্রথা অনুযায়ী বাদশাহকে সিজ্‌দা না ক'রে 'আস্‌সালামু আ'লাইকুম' বলে শুভেচ্ছা জানান। এতে বাদশাহ্‌ ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। দরবারী আলেমরা মুজাদ্দিদ সাহেবকে শায়েস্তা করার একটা উত্তম সুযোগ পেয়ে যান। তাঁদের দৃষ্টিতে এ ছিল মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরাট অপরাধ। এই অপরাধের জন্য মুজাদ্দিদ সাহেব চরম সাজা পাওয়ার উপযুক্ত বলে তাঁরা ঘোষণা করেন। অতঃপর দণ্ডবিধি অনুযায়ী সম্রাট তাঁকে কারারুদ্ধ করার আদেশ দেন। মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন। কিন্তু সম্রাটের ক্রোধ, দরবারীদের আক্রোশ কিংবা গোয়ালিয়রের প্রস্তর-প্রাচীর ঘেরা অন্ধকার প্রকোষ্ঠের বন্দীত্ব মুজাদ্দিদ সাহেবের মনের দৃঢ়তা, বীর্যবত্তা ও ইমানী শক্তিকে না দমিয়ে আরো বলীয়ান করে তোলে। তিনি দুর্গের বন্দী ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার আরম্ভ করেন। অচিরেই এর সুফল ফলতে দেখা যায়। তাঁর আচার-আচরণে ও চরিত্র-মাধুর্যে সবাই মুগ্ধ হয় এবং তাঁর দাওয়াত কবুল করতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের জীবনের গতিধারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। দুর্গাধিপতি এসম্পর্কে জাহাঙ্গীরের কাছে রিপোর্ট পাঠান,—"এই বন্দীর প্রভাবে এখানকার পশুগুলো মানুষে এবং মানুষ-গুলো ফেরেশতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।"

রিপোর্ট পেয়ে জাহাঙ্গীর অভূতপূর্ব ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং সাথে সাথে মুজাদ্দিদ সাহেবকে মুক্তি দিয়ে সসম্মানে দিল্লী নিয়ে আসার হুকুম দেন।

মুজাদ্দিদ সাহেবকে মুক্তি দেয়া হলো। এখন তিনি মুক্ত। শুধু তাই নয়। শাহী দরবারে আমন্ত্রিত ও সম্মানিত মেহমান। তিনি দিল্লী আসছেন। জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুররম (শাহজাহান)-কে আদেশ দিলেন, তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আনতে। যুবরাজ অগ্রবর্তী হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনলেন। দরবারে পেঁৗছলে স্বয়ং সম্রাটও তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। কিন্তু এখানেও মুজাদ্দিদ সাহেব আপন মিশনকে ভুলে যাননি। বিস্মৃত হননি আপন কর্তব্য ও দায়িত্বকে। "অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী মুশরেকী সিজ্‌দা ও কাফেরী স্তুতি স্তাবকতায় কলুষিত মোগল দরবারের সমগ্র অশুভ পরিবেষ্টনকে কম্পিত করিয়া মুজাদ্দিদ সাহেবের তেজদৃপ্ত কন্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল আবার সেই আস্‌সালামু আলাইকুম"-এর মধুর আহবান।" অথচ এই ধরনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের কারণেই তাঁর কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল।

এরপর সম্রাটের সঙ্গে তাঁর বাণী ও মত বিনিময় হয়। মুজাদ্দিদ সাহেব সম্রাটকে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনাচারের অশুভ পরিনাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেন। সম্রাটের কাছে ইসলামের নামে দাবী জানান ঃ

১. বাদশাহকে সিজ্‌দা করার রীতি সম্পূর্ণভাবে রহিত করতে হবে।

২. মুসলমানদের গরু জবেহ্‌ করার অনুমতি দিতে হবে।

৩. বাদশাহ ও তাঁর দরবারীদেরকে জামায়াতে নামায পড়তে হবে।

৪. কাজীর পদ ও শরীয়ত বিভাগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৫. সমস্ত বেদা'ত ও ইসলামবিরোধী অনাচারকে সমূলে উৎখাত করতে হবে।

৬. ইসলাম-বিরোধী যাবতীয় আইন রহিত করতে হবে।

৭. ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মসজিদগুলোকে পুনরায় আবাদ করতে হবে।

সম্রাট এসব দাবী সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিলেন এবং এ সম্পর্কে শাহী

ফরমানও জারী করলেন। এটা হলো মুজাদ্দিদ সাহেবের এক বিরাট বিজয় ও সফলতা। এ হলো তাঁর সংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু কিভাবে তিনি এই বিরাট সফলতা অর্জন করলেন, এর মধ্যে কি কার্যকারণ নিহিত রয়েছে, আর কোন্ কর্মসূচীই বা তিনি অনুসরণ করলেন, তার বিস্তারিত তথ্য জানা দরকার।

স্বয়ং মুজাদ্দিদ সাহেবের বিভিন্ন সময় লেখা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে এ সম্পর্কে আমরা সম্যক জানতে পারি। বিশেষত তাঁর আন্দোলন বোঝার জন্য তাঁর লেখাই সঠিক মাপকাঠি হওয়া উচিত।

সাধারণত রোগের চিকিৎসার জন্য রোগ সম্বন্ধে প্রথমে সঠিক জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। এরপর রোগ-নির্ণয় এবং তাঁর ভিত্তিতে ঔষধ নির্বাচন করতে হয়। ঠিক তদ্রূপ সমাজ-দেহের সংস্কার-সাধনের জন্যও প্রথমে সামাজিক রোগ তথা অনাচার সম্বন্ধে পূর্ণভাবে ওয়াকেফহাল হতে হয়, এর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে হয়।

তারপরই কেবল এর উচিত চিকিৎসা সম্ভব হয়। আর এই জ্ঞান মুজাদ্দিদ সাহেবের যে পুরোপুরিই ছিল তার প্রমাণ তাঁর লেখাতেই আমরা পাই। তিনি লিখছেন,—

"প্রিয় পুত্র। এটা এক কঠিন সময়। পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে অনুরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতেই একজন বিশেষ শক্তিশালী নবী প্রেরিত হ'তেন এবং নতুন শরীয়তের পত্তন করতেন। কিন্তু এই উম্মাত সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এর নবীই সর্বশেষ রসূল। তাঁর উপর তাঁর পরিজনদের উপর এবং তাঁর সাথীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! এই উম্মাতের আলেমদেরকে বনী ইস্‌রাঈলের নবীদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নবীগণের প্রেরণের পরিবর্তে এসব আলেমরা বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। এজন্যই প্রতি শতাব্দীর সমাপ্তির পর এই উম্মাতের আলেমদের মধ্য থেকে একজন মুজাদ্দিদ নিয়োগ করা হয়। তিনি নবী মুস্তাফা (সঃ)-এর শরীয়তকে জিন্দা করেন। বিশেষত অতীত জাতি-গুলোর মধ্যে এক হাজার বছর পর পর বিরাট মর্যাদার অধিকারী একজন রসূল প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। শুধু নবী প্রেরণের উপরই নির্ভর করা হতো না। এখন আর নবী ও রসূল আসবেন না। তাই উম্মাতে

মুহাম্মদীয়ার মধ্যে এখন এমন একজন দায়িত্বশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন আলেমের প্রয়োজন যিনি পূর্ণ জ্ঞানী হবেন, দৃঢ়চিত্ত নবীর কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন।" (ওলামায়ে হিন্দ-কা শানদার মাজিয়ে জাদীদ, পৃঃ ১৪৭)

মুজাদ্দিদ সাহেব যুগ সম্পর্কে কত সজাগ ছিলেন এ পত্রই তার প্রমাণ। দেশ ও জাতি এবং ধর্মের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে কতটা সতর্ক ছিলেন এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কিরূপ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কি কর্মপন্থাই বা গ্রহণ করেছিলেন এবং এতে কতটুকু সফল হয়েছিলেন পরবর্তী আলোচনায় তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চারিত্রিক সংশোধন ও সংঘবদ্ধকরণ

শেখ আহামদ সারহিন্দী (রাঃ) দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ও নবীর নায়েব রসূল (সঃ)-এর আমানত দ্বীন ইসলামের যথাযথ অনুসরণই এই দায়িত্ব আদায়ের একমাত্র পথ। মুজাদ্দিদ সাহেব সেই পথেই কাজ করে যান। তিনি প্রথমত লোকদের সামনে দ্বীনের সঠিক রূপটি তুলে ধরেন যাঁরা তা গ্রহণ করে তাঁদেরকে সংঘবদ্ধ করেন এবং তাঁদের চারিত্রিক দিক অর্থাৎ ইমান, আকিদা ও আচার-আচরণ সংশোধন করাতে সচেষ্ট হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর মুজাদ্দিদ সাহেবকে অভিযুক্ত করে আত্ম-জীবনীতে যা লিখেছেন তাতে মুজাদ্দিদ সাহেবের এই কর্মধারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীর লিখছেন,—

শেখ আহমদ নামীয় জনৈক ধোঁকাবাজ (নাউজুবিল্লাহ) সারহিন্দে ধোঁকা ও প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে। বহু অন্তঃসারশূন্য জাহির পোরস্ত (বাহ্যিক পুজারী) লোক তার খপ্পরে পড়ে গেছে। প্রতিটি শহর ও পল্লীতে সে আপন মুরীদদের এক এক জন খলীফা (প্রতিনিধি) বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এসব লোক পসরা সাজানো অধ্যাত্ম ব্যবসা এবং মানুষকে ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক চতুর।

আর এই ব্যক্তি তার মুরীদ ও তার উপর আস্থাবানদের নামে ইনিয়ে-বিনিয়ে বহু বাহ্যিক কথা লিখে একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। এর নাম রেখেছে 'মাকতুবাত' (পত্রাবলী)।" পৃঃ ২৭৪-৭৫

মুজাদ্দিদ সাহেবের সময় বেদা'ত ও কু-সংস্কারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সংশোধন ও হেদায়েতের পন্থা ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনি বেদা'য়েতে প্রকাশ্য বিরোধিতায় না গিয়ে রসুল (সঃ)-এর সুন্নাতে অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। আর এটাকেই সফলতা ও সৌভাগ্যের একমাত্র পথ বলেই ঘোষণা করতেন। তিনি বলছেন,—

"বন্দেগীর সকল প্রকার হক আদায় করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বদা ও সবসময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই মানব-সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। এই অবস্থা ঠিক তখনি সৃষ্টি হবে মানুষ যখন দুনিয়া ও আখেরাতের মহান নেতার আদর্শকে প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় পূর্ণরূপে অনুসরণ করবে।"[১]

প্রকৃতপক্ষে পার্থিব শান্তি ও উন্নতি এবং পরকালীন মুক্তি একমাত্র নবীর আদর্শের অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। এজন্য একজন মুসলমান যখন পূর্ণভাবে নবীর আদর্শের অনুসরণ করে—তখনি সে আল্লাহর সত্যিকার বান্দায় পরিণত হয়—উন্নতি হয় আল্লাহর প্রেমাস্পদের পর্যায়ে, লাভ করে সফলতা ও পূর্ণতা। এই সফলতা লাভকারী ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে মুজাদ্দিদ সাহেব বনী ইস্রাঈলের নবীগণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলছেন,—

"দৃঢ় প্রত্যয়শীল মহা মর্যাদার অধিকারী নবীগণও শেষ নবী (সঃ)-এর আদর্শের অনুসরণের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। যদি হুজুর সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক সময়ে মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনিও রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করতেন।"[২]

সুন্নাত ও বেদা'তের প্রকারভেদ

সুন্নাত ও বেদা'ত সম্বন্ধে মানুষের ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। কোন্ কাজ সুন্নাত আর কোন কাজ বেদা'ত এ নিয়ে

---

১. পত্র নং ১১০, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩২

২. পত্র নং ২৪৯; ১ম খন্ড পৃঃ ২৬৮

বিতর্কের অন্ত ছিল না। মুজাদ্দিদ সাহেব এর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দান করেছেন। তিনি লিখছেন,—

"সরোয়ারে দো'জাহানের (সঃ) সব আমল দু'ধরনের ছিল। এক- ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত, দুই, অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত।

১. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যেসব আমল ইবাদত হিসেবে করেছিলেন, - তার বিপরীত আমলকেই আমি বেদা'তে মুনকার (অবশ্য অবশ্য নিষিদ্ধ) বলে মনে করি। তার প্রতিরোধ ও গতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি। কেননা দ্বীনের মধ্যে এটাই হলো এমন ধরনের সংযোজন অবশ্য পরিত্যাজ্য।

২. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যে সব কাজ দেশ-প্রথা ও অভ্যাস হিসেবে করতেন—তার বিপরীত কাজকে আমি বেদা'তে মুনকার মনে করি না। এর প্রতিরোধ ও গতিরোধে অপ্রয়োজনীয় প্রয়াসও চালাই না। কেননা, দ্বীনের সাথে এ কাজের কোন সম্পর্ক নেই। তার উদ্ভব প্রচলিত প্রথার কারণেই হয়েছিল। দ্বীন ও মিল্লাতের কারণে নয়।

এক শহরের রীতি-রেওয়াজ অন্য শহরের রীতি-রেওয়াজ থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এমন কি একই শহরেও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রথা, রীতি-রেওয়াজ ও অভ্যাসের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। তবে এতদ্সত্ত্বেও হুজুর (সঃ)-এর এ ধরনের সুন্নাতের অনুসরণ এবং এমন সুন্নাতের উপর আমলও সর্বোত্তম সফলতা দান করে,— পরিণামের কারণ হয়।"[১]

আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পর্কেও মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর (রঃ) একই ধারণা। এখানেও রসুল (সঃ)-এর আদর্শই তাঁর একমাত্র দিশারী। যে কর্মের সঙ্গে নবীর আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই তা যে-কোন নামেই করা হোক না কেন—সেটা নিষ্ফল হ'তে বাধ্য। মুজাদ্দিদ সাহেব বলছেন,—

"প্রিয় পুত্র! কিয়ামতের দিন একমাত্র রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণই কাজে আসবে। সূফীদের হাল, ওয়াজ্দ, জ্ঞান, মা'রেফ রহস্য এবং ইঙ্গিতে যদি এই আদর্শ অনুযায়ী এবং সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে হয়—তবে ভাল কথা। আর তা না হলে সবই ব্যর্থ ও ক্ষতিকর।

---

১. পত্র নং ২৪৫, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৬

পরিনামে এসব আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগের কারণ হবে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল ও তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো। হযরত জুনায়েদ (রঃ) জওয়াব দিলেন,—

"সকল রহস্য ও ইশারা শেষ হ'য়ে গিয়েছে। সমস্ত জ্ঞান ও মায়া'রেফ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। শুধুমাত্র ওই কয়টি রাক্‌য়াত নামাযই কাজে এসেছে—রাতের গভীরে যা পড়েছিলাম।

সুতরাং রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলাকে জরুরী মনে করো। কেননা, এর সম্পূর্ণটাই বরকত্‌ ও কল্যাণকর। আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীয়তের বিরোধিতা থেকে পূর্ণভাবে হুঁশিয়ার থেকো। কথা-বার্তায় কাজে-কর্মে এবং আকিদা-বিশ্বাসে কখনো যেন তা না হয়। কেননা, এই বিরোধিতা সম্পূর্ণ অশুভ ও ধ্বংসের কারণ।"[১]

এই মোবারক ও পসন্দনীয় অনুসরণের অনু পরিমাণ অংশ দুনিয়ার সকল স্বাদ আস্বাদ এবং আখেরাতের তামাম নেয়ামত থেকে উত্তম। একমাত্র রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণ দ্বারাই অনুগ্রহ লাভ করা যায়, এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভের এটাই একমাত্র পন্থা।

যেমন-কাইলুল্লা'—(দ্বিপ্রহরে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ আরাম করা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণের নিয়তে যদি করা হয়—তবে তা রসূল (সঃ)-এর অনুসরণহীন কোটি কোটি রাত্রিজাগরণ থেকেও উত্তম।

ঈদ-উল-ফিতরের দিন রোযা ভাঙা—শরীয়ত যার নির্দেশ দিয়েছে—চিরকাল রোযা রাখার চাইতে উত্তম।

আধ্যাত্মিক সাধনাকারীরা বহু প্রকারের মুজাহেদা ও সাধনা করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের এই সাধনা যদি পবিত্র শরীয়ত অনুযায়ী না হয় তবে তা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হবে। যদি এসব কঠিন কাজের উপর কোন পুরস্কার নির্ধারিতও হয়—তবে তা পার্থিব বই কিছু নয়।

দুনিয়ার কোন ফল লাভের কি মূল্য রয়েছে? যেখানে সারা দুনিয়াটাই মূল্যহীন। এমন লোকদের উদাহরণ মেথরদেরই অনুরূপ। তাঁদের

---

১. পত্র নং ১৮৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫

সাধনা ও পরিশ্রম সকলের অধিক। কিন্তু পারিশ্রমিক সবার চাইতে কম।

পবিত্র শরিয়তের অনুসারিরা হলেন জাওহারী, স্বর্ণকার ও আলংকারিকদের মত। কাম খুব কম, লাভ অনেক বেশী।

রহস্য এই যে, যেকাজ শরীয়ত অনুযায়ী হবে—তা আল্লাহ্‌র নিকট পসন্দনীয়—যার সার্টিফিকেট তাঁরই কাছে বিদ্যমান। এ ছাড়া যাবতীয় কাজ তাঁর অপসন্দনীয়। যেমন,—

'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদে' (কৃষ্ণ প্রস্তর) চুমু খাওয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে কুফর। কিন্তু এটি রসূল (সঃ)-এর নির্দেশ—সুতরাং তা ফরয।'

সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, সকল পুন্য ও শুভ কর্ম এবং সৌভাগ্যের পুঁজি হলো নবীর আদর্শের অনুসরণ,—আর সমস্ত খারাবী ও অনিষ্টের মূল হলো শরীয়তের বিরোধিতা।"[১]

"যেসব আমল দ্বারা আল্লাহ্‌ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়, তা কি ফরযগুলো-না নফলগুলো? ফরযগুলোর মোকাবিলায় নফলগুলোর কোন মূল্যই নেই। যথাসময় কোন একটি ফরয আদায় করা, হাজার বছর নফল আমলের চেয়ে উত্তম। চাই তার নিয়ত যতই একনিষ্ঠ ও খালেস হোক না কেন।

নামায, রোযা, যিক্‌র, মোরাকাবা (ধ্যান) প্রভৃতি যত প্রকারের নফল আছে। (সবার একই অবস্থা)। আর আমি তো বলে থাকি যে, ফরয আদায়ের সময় সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্বন্ধেও এই একই নির্দেশ।

বর্ণিত আছে যে, একদিন আমিরুল মু'মেনিন ওমর ফারুক (রাঃ) ফযরের নামাযের পর জামায়াতে উপস্থিত মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ্য করেন। কিন্তু তিনি তাঁর একজন বন্ধুকে অনুপস্থিত পান। জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে ব্যক্তি কেন জামায়াতে হাজির হয়নি? উপস্থিত লোকেরা জবাব দিলেন—তিনি রাত্রিজাগরণকারী। মনে হয় যে, এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওমর ফারুক বললেন—যদি সারারাত ঘুমিয়ে থাকতো,

১. পত্র নং-১১৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫)

আর ফযরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতো তবে তা-ই উত্তম ছিল।

সুতরাং কোন মুস্তাহাব কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাক্‌রুহে তাহরীমী তো বড়ো কথা,—মাকরুহে তান্‌জীহী থেকেও সাবধানতা অবলম্বন—করা যিকর, ফিকর ও মোরাকাবার চাইতে বহুগুণে উত্তম।

তবে হাঁ-সুন্নাতের অনুসরণ এবং মুস্তাহাবের অনুকরণ অব্যাহত রেখে যদি-যিকর ফিকর প্রভৃতি করা হয়—তা হ'লে নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি সফলকাম হবে।"[১]

"আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রেরণের এবং শরীয়তের বাধ্য-বাধকতার উদ্দেশ্য ও হেক্‌মত হলো কু-প্রবৃত্তিকে জব্দ করা ও তার ধ্বংস-সাধন। প্রবৃত্তির খাহেশকে দমানোর জন্যেই শরীয়তের নির্দেশাবলী জারী হয়েছে।

শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী যে পরিমাণ আমল করা হয় ঠিক সে পরিমাণ খাহেশে নফ্‌সানীরও পতন ঘটে। সুতরাং প্রবৃত্তির লালসা দমানোর উদ্দেশ্যে শরীয়তের কোন একটি হুকুম মানা, এমন হাজার বছর ব্যাপী মুজাহেদা ও সাধনা করার চেয়ে উত্তম—যা নিজের রায় অনুযায়ী করা হয়। বরং এসব মুজাহেদা ও সাধনা যদি শরীয়ত অনুযায়ী না হয়—তবে তা নফসেরই সহায়তাকারী হয়, তার শক্তিই বাড়িয়ে তোলে।

ব্রাহ্মণ ও যোগী-সন্ন্যাসীরা ব্রত ও কঠোর সাধনায় কোন ত্রুটি করেনি। কিন্তু কেউই লাভবান হয়নি ওসব দ্বারা বরং তাদের প্রবৃত্তির লালসারই শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

যেমন, জাকাতের একটি কড়ি প্রদান,—শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী যা আদায় করা হয়েছে,—নিজের রায় অনুযায়ী হাজার গুণ প্রদানের চেয়েও উত্তম। শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী প্রবৃত্তির লালসা দমানোর উদ্দেশ্যে ঈদের দিন খানা খাওয়া,—নিজের বিবেচনা অনুযায়ী বহু বছর পর্যন্ত রোযা রাখার চাইতেও অধিক সুফলদায়ক।

সারারাত নামায পড়ার চাইতে ফযরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করলে অধিক ফজিলত পাওয়া যায়।

---

১. পত্র নং ২৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬

পরিস্কার কথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নফ্‌স পাক পবিত্র না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নাজাত ও মুক্তি অসম্ভব। সুতরাং চিরন্তন মৃত্যুর হাত থেকে নাজাত হাসিলের জন্য এই রোগ দমন করা নিতান্ত জরুরী।"[১]

আকিদা ও বিশ্বাসের সংশোধন এবং দৃঢ় করণই হলো মৌলিক ও অপরিহার্য বিষয়। মুজাদ্দিদ সাহেব এ সম্পর্কে যুক্তি দিচ্ছেন,—

"হেকিম চিকিৎসকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রুগীর রোগের সম্পূর্ণ উপসম না হবে—কোন খাদ্যই তার জন্য উপকারী নয়—বরং তা রোগ বৃদ্ধিরই সহায়ক। এজন্য সবার আগে তাঁরা রোগের উপশম ঘটান। তারপর ক্রমে ক্রমে যথাযোগ্য ও উপযুক্ত খাদ্য দিয়ে থাকেন। ঠিক তদ্রূপ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির 'কলব' (আত্মা) রোগগ্রস্ত থাকবে,—ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ইবাদত কিংবা কোন সাধনাই ফলদায়ক হ'তে পারে না। বরং তা ক্ষতিকরই হয়ে থাকে।"[২]

"পবিত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী যে-ভাবে সত্যবাদী আলেমগণ আকিদাকে বুঝেছেন—ঠিক সেভাবেই নিজেদের আকায়েদকে পরিশুদ্ধ করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের বুদ্ধি ও অনুভূতি বিবেচ্য ও গ্রহণীয় নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ওসব মহান ব্যক্তিদের ব্যাখ্যা ও তাফসীর অনুযায়ী হবে।

প্রত্যেক বেদা'তী ও বিভ্রান্ত ব্যক্তি স্বীয় বাতিল আকিদার যথা-যোগ্যতা প্রমাণের জন্য কুরআন ও সুন্নাহরই আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং দোহাই পেড়ে থাকে। অথচ নিঃসন্দেহে তা নিষ্ফল ও নির-র্থক। সুতরাং সর্বাগ্রে আকায়েদের পরিশোধন নেহায়েত জরুরী। এর-পর হালাল হারাম, ফরয-ওয়াযিব প্রভৃতি শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন,—তারপর তদনুযায়ী আমল এবং এরপরই 'তাজ-কিয়ার' (আত্মার বিশুদ্ধিকরণ) স্থান।

যতক্ষণ পর্যন্ত আকায়েদ ঠিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের আহকাম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন কোনই উপকারে আসবে না। আর যে

১. পত্র নং ১০৫, ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৭

২. পত্র নং ৫২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭০

পর্যন্ত এ দু'টোই না হবে, সে পর্যন্ত আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধিও অসম্ভব।

এই চারটির পূর্ণতা বিধানের পরেই সুন্নাত ও নফলের স্থান। এরপর আর যা—সবই অতিরিক্ত, নিষ্ফল ও নিরর্থক। রসূলুল্লাহর বাণী অবশ্যই পালনীয়—من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه অর্থাৎ "নিরর্থক বিষয় পরিহার করাই ইসলামের সৌন্দর্য।"

এরপর তিনি শরীয়তের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,—

"শরীয়তের তিন অংশ—জ্ঞান (এল্ম), কর্ম (আমল) ও নিষ্ঠা (ইখ্‌লাস)। যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিনটি না হবে—শরীয়তও হবে না। যখন শরীয়ত প্রমাণিত ও বাস্তবায়িত হয়ে গেল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও হাসিল হয়ে গেল। এটা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সৌভাগ্য ও যাবতীয় বস্তুর উর্ধ্বে। رضوان من الله اكبر (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ)।

সুতরাং ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় সৌভাগ্যের চাবিকাঠি একমাত্র শরীয়ত। কোন বাসনা ও উদ্দেশ্য নেই—যার জন্য শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।

'তরিকত' ও 'হাকিকত' (আধ্যাত্মিকতা) সুফীদের বৈশিষ্ট্যগুণ। কিন্তু এ দু'টো জিনিস শরীয়তের তৃতীয় অংশ অর্থাৎ 'এখলাস'-এর পূর্ণতার জন্য শরীয়তের খাদেম বিশেষ। সুতরাং তরিকত ও হাকিকত হাসিলের মাধ্যমে একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লো শরীয়তের পূর্ণতাবিধান।"[১]

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব সম-সাময়িক কতগুলো বেদা'ত ও কু-সংস্কারের উল্লেখ করেছেন। সেগুলো আজো আমাদের সমাজে বিদ্যমান। —এগুলো পরিহারের উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। ব্যষ্টির বিশ্বাস ও আকিদার সংশোধন-প্রয়াসের পর এবার তিনি সামষ্টিক ও সামাজিক অনাচার এবং কু-সংস্কারের উচ্ছেদসাধনে সচেষ্ট হয়েছেন। বলছেন,—

"এযুগের বিশিষ্ট ও সাধারণ ব্যক্তিদের অধিকাংশই নফল কাজ আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর ফরয কাজের প্রতি চরম

১. পত্র নং ৩৫, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫০

অলসতা ও উপেক্ষা দেখাচ্ছেন। না তাঁরা ফরযের সঙ্গে জড়িত সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখেন,—না মুস্তাহাব সময়ে তা আদায় করেন। আর না নামাযে প্রথম তাক্‌বীরের প্রতি গুরুত্ব দেন। বরং তাঁদের জামায়াতে অংশগ্রহণও শুধু নামকা-ওয়াস্তে। ফরয নামায যে কোন ভাবে আদায় হয়ে যাওয়াকেই তারা যথেষ্ট মনে করেন। অবশ্য আশুরার দিন, শবে-বরাত, ২৭শে রজব এবং রজব মাসের প্রথম শুক্রবারের রাতের প্রতি তাঁরা পুরাপুরি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এসবের নাম রাখা হয়েছে 'লাইলাতুর রাগায়েব' (আগ্রহপূর্ণ রজনী)। তাঁরা এসব রাত্রে পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে ও পূর্ণ ব্যবস্থাধীনে জামায়াতের সাথে নফল কাজসমূহ আদায় করেন। আর এটাকে বড়ো সওয়াব ও পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, এটা শয়তানের একটা ধোকা, সে গুনাহ্ ও খারাব কাজকে পুণ্য ও সুন্দর কাজের অনুরাগে পেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে।'[১]

আলেমরা ''বলে থাকেন যে, বেদা'ত দু'প্রকার,—বেদা'তে হাসানা ও বেদা'তে সাইয়্যেয়াহ্। বেদা'তে হাসানা' ('উত্তম বেদা'ত) সেই নেক আমল ও পুণ্য কাজকেই তাঁরা নাম দিয়েছেন, যা নবীর এবং খোলা-ফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তা করলে কোন সুন্নাত বর্জিত হয় না।

আর বেদা'তে সাইয়্যেয়াহ্ (নিকৃষ্ট বেদা'ত) হলো, যা করতে গেলে সুন্নাত বর্জিত হয়ে যায়।

এই অধম ওসব বেদা'তের কোনটির মধ্যেই সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার কিছু দেখতে পায় না। বরং শুধু অন্ধকার, পঙ্কিলতা ও ত্রুটিই অনুভব করে।

অবশ্য আজ যদি কোন বেদাতী'দের মধ্যে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে বাহ্যত সজীবতা ও কল্যাণ লক্ষ্যগোচর হয়ও,—তবুও আগামী-কাল যখন দৃষ্টিশক্তি বলীয়ান হবে তখন বুঝতে পারবে যে, এর পরিণাম একমাত্র ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

১. পত্র নং ২৮৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৩

মানব শ্রেষ্ঠ মহানবীর (সঃ) বাণী,—

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد -

অর্থাৎ "আমাদের এই কাজে (ইসলাম) কেউ এমন নতুন কোন কিছুর উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই তবে তা পরিত্যাজ্য ''

যে জিনিস পরিত্যাজ্য হয় তা কি করে সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পারে? বিশ্বনবী আরো ইরশাদ করেছেন,—

اوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان کان عبدا حبشیا فانه من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة -

অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ভীতি, (খলীফার নির্দেশ) শোনা ও মানার অসিয়ত করছি—যদিও কোন হাবশী গোলামই (শাসক) হোক না কেন। আমার পরে তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে—সে অনেক বেশী এখতেলাফ ও মতভেদ দেখতে পাবে। তোমাদের উপর অবশ্যকর্তব্য,—আমার ও হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুযায়ী চলা। তা থেকেই দলীল-প্রমাণ নিবে এবং দৃঢ়ভাবে তাকেই আঁকড়িয়ে থাকবে। নব-উদ্ভাবিত আমল বেদা'ত প্রত্যেক বেদা'তই গোমরাহী ও ভ্রান্তি।"

যা হোক। যখন প্রত্যেক নতুন আমলই বেদা'ত হলো—আর প্রত্যেক বেদা'ত হলো গোমরাহী,—তাহ'লে বেদা'তের মধ্যে সৌন্দর্য কিভাবে আসতে পারে? এ ছাড়া হাদীসে জানা যায় যে, প্রত্যেক বেদা'ত সুন্নাতকে উচ্ছেদ করে দেয়। তাতে কোন বেদা'তকেই নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং সব বেদা'তই সাইয়্যেআহ্ হবে। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলছেন,—

'যখনই কোন জাতি কোন বেদা'ত উদ্ভাবন করে—তখনই ঠিক অনুরূপ একটি সুন্নাত উঠিয়ে নেওয়া হয়। সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে থাকা ও তা থেকেই দলীল প্রমাণ গ্রহণ করা—বেদা'ত উদ্ভাবন থেকে

উত্তম। হযরত হাস্‌সান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে জাতি যদি নিজের দ্বীনের কোন বেদা'ত সৃষ্টি করে—তাহ'লে আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদের থেকে ঠিক অনুরূপ একটি সুন্নাতকে ছিনিয়ে নেন। এরপর সেই সুন্নত তাদের মধ্যে আর কিয়ামত পর্যন্ত ফিরে আসে না।

যেমন, কিছু সংখ্যক আলেম ও পীর মৃত ব্যক্তির জন্য পাগড়ীকে বেদা'তে হাসানা বলেছেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় তা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতকেই বর্জন করা হয়। কেননা, মুর্দার জন্য তিনটি কাপড়ই সুন্নত। এর উপর পাগড়ী অতিরিক্ত বাড়ানো হলে তা "তিন" এই সংখ্যাকে বাতিল করে দেয়। এরই নাম হলো সুন্নাতের 'উচ্ছেদ সাধন।'

অনুরূপভাবে কিছু সংখ্যক আলেম বলেন যে, নামাযের নিয়ত মুখেও আদায় করতে হবে। তা হ'লে মুখে ও অন্তরে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে। মুখে নিয়ত করাকে বেদা'তে হাসানা বলা হয়ে থাকে। অধমের মতে এই বেদা'তের দ্বারা সুন্নত তো ছোট কথা—ফরয পর্যন্ত খতম হয়ে যায়। কেননা, অনেক সময় সাধারণ মানুষ মুখে তো নিয়ত পড়ে ফেলে—কিন্তু তার মন কিছুতেই সেদিকে নিবদ্ধ হয় না। অথচ মনে নিয়ত করাটাই ফরয ছিল। নিঃসন্দেহে এই বেদা'ত দ্বারা ফরয নষ্ট হয়ে যায়। আর যখন নিয়ত হলো না তখন নামাযও হয়নি। সকল বেদা'তের এই একই অবস্থা।

তবে কেয়াস (অনুমান) ও ইজতেহাদের কোন সম্পর্কই বেদা'-তের সঙ্গে নেই। কেননা কিয়াস ও ইজতিহাদ অতিরিক্ত কোন কিছুর সৃষ্টি করে না। বরং তা একমাত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্দেশ্য মর্মার্থকেই প্রকাশ করে থাকে।"[১]

মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রঃ) হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর আল্লাহভীতি গভীর জ্ঞান ও মনীষা সম্পর্কে মুজাদ্দিদ সাহেবের বহু বর্ণনা রয়েছে। এক পত্রে তিনি বলছেন,—

"ইমাম আবু হানিফা যেন গৃহের মালিক আর অন্যান্য ইমামরা-

১. পত্র নং ১৭৬, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮৬-৮৭

পোষ্য ও পরিজন। এ কারণে আমি এই মাযহাবেরই অনুসারী। তবে ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) সাথে আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা ও হৃদ্যতা রয়েছে। আমি তাঁকে বুজুর্গ ও মহান ব্যক্তি বলে জানি। কোন কোন নফল ইবাদতে তাঁর মাযহাবের 'তাকলীদ'ও করে থাকি। অপরাপর ইমামদের অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং পুণ্যময়তা সত্ত্বেও ইমাম আযমের মোকাবিলায় তাঁদেরকে আমার কাছে শিশু শ্রেণীর ছাত্র বলে মনে হয়। কেন তা হয় এর কোন উত্তরই আমি খুঁজে পাইনে।"[১]

খাজা হিসামুদ্দীন আহমদ মুজাদ্দিদ সাহেবের একজন ভক্ত। মীলাদ শরীফ সম্বন্ধে তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের কাছে একখানা পত্র লিখেন। তাতে জিজ্ঞেস করেন, মধুর সুরে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করলে, ও নাত, কবিতা, গজল ইত্যাদি পড়লে কোন অসুবিধা আছে কিনা। তিনি আরো জানতে চান, যদি এমনভাবে পড়া হয়, যাতে হরফের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়, গানের মতো সুরের উঠা-নামা করে তা'হলে সেরূপ পড়া নিষিদ্ধ। কবিতা আবৃত্তিতে এটা না-যায়েজ। কিন্তু এসব ক্ষতিকর ও আপত্তিকর জিনিস থেকে মুক্ত হতে কোন বাধা আছে কিনা।

মুজাদ্দিদ সাহেব এর জবাবে লিখছেন,

"বৎস! অধমের মনতো এটাই বলছে যে, এই প্রথার প্রচলন না হোক। স্বার্থান্ধরা যায়েযকেও নাজায়েয করে ছাড়ে যদি সামান্য কম অনুমতিও পাওয়া যায় তবে পরিণামে অনেক কিছুই হয়ে যাবে।"[২]

সাহাবীদের প্রতি ভক্তি

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথী-সাহাবায়েকেরামের প্রতি মুজাদ্দিদ সাহেবের ভক্তি ছিল অপরীসীম। কারণ, ইসলামের জন্য এঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষাই ছিল সর্বাধিক। এক পত্রে তিনি বলছেন,—

"কাফেরের সংসর্গ থেকে বিদা'তীর সংসর্গের বিপর্যয় সর্বাধিক। সকল বিদা'তীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম বেদা'তী হলো সেই দল,—যে সাহা-

---

১. পত্র নং ৫৫, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯০৭-৮

২. পত্র নং ৭২ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯১৬

বায়ে কেরাম (রাঃ) সম্বন্ধে শত্রুতাভাব রাখে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে তাদেরকে কাফের বলেছেন। যেমন— ليغيظ بهم الكفار

'রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "যখন ফেতনা দেখা দিবে, বেদা'ত প্রসার লাভ করবে এবং আমার আসহাবদেরকে গালি দেয়া শুরু হবে—তখন আলেমদের উপর ফরয তাদের এলম ও জ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং সে অনুযায়ী চলা। যে এরূপ না করবে, তার উপর আল্লাহর ফেরেশ্তাদের এবং সমস্ত মানুষের লা'নত ও অভিশাপ। না তার কোন ফরয কবুল হবে না কোন নফল।"'[১]

মুজাদ্দিদ সাহেব 'সামানা' শহরের সর্দার, কাজী (বিচারপতি) এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে লিখছেন,—

"জানা গেছে যে আপনাদের সেখানে শহরের খতীব কোরবানীর ঈদের খোতবায় খোলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র নামের উল্লেখ ছেড়ে দিয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক এদিকে খতীব সাহেবের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে। কিন্তু তিনি 'ভুল হওয়া' 'স্মরণ না থাকা' প্রভৃতি সন্তোষজনক কোন ওজর আপত্তি না দেখিয়ে নিতান্ত কঠোর ও দাম্ভিকতাপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। এবং বলেছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম নেওয়া হয়নি, তাতে কি হয়েছে? আরো জানা গেছে যে, সেখানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও নাকি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ রয়েছেন এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন। কঠোর মনোভাব নিয়ে এই জালেম খতিবের কাছে কোন কৈফিয়ৎ তলব করেননি। আফ্সোস! শতবার আফ্সোস!!

খোতবায় যদিও খোলাফায়ে রাশেদীনের নামোল্লেখ কোন শর্ত নয় তবুও তা আহ্লে সুন্নাত-ওয়াল্ জামায়াতের একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তাঁদের প্রচেষ্টার প্রতিদান দিন।

যার অন্তর রোগগ্রস্ত ও কালিমাযুক্ত, একমাত্র সেই ব্যক্তিই খোতবায় ইচ্ছাকৃতভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের নামোল্লেখ পরিহার করতে পারে। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এই বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা বশতঃ এই মোহারক নামের উল্লেখ পরিহার করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা—তা বিদ্বেষ

---

১. পত্র নং ৫৫ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১

২. পত্র নং ২৫১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৫

বশতঃ পরিহার করে তাদের সঙ্গে তো মিল হয়ে গেল। তাহলে—مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ—অর্থাৎ যে জাতির অনুকরণ করলো সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এই হাদীসের কি উত্তর আছে? হাদীসে আরো এরশাদ হয়েছে—اِتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ। অর্থাৎ তোহমত ও কটূক্তি থেকে বেঁচে থাকো। তাহ'লে এস্থলে কটূক্তি থেকে এই খতিবের রক্ষা পাওয়া কিভাবে সম্ভব.........?

এই জালিম খতিবকে জানিয়ে দেয়া উচিত যে, সকল সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসতে আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ও তাদেরকে কষ্ট দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আর সাহাবাদের মধ্যে শায়খয়াইন হলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর। তাঁরা রসুল (সঃ)-এর আত্মীয় ও নিঃসন্দেহে তাঁরা সবার চেয়ে অধিক ভালবাসা ও প্রীতি পাওয়ার অধিকারী।

বর্তমান সুলতান সুন্নী ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী তাঁর সময়ে এ প্রকারের বেদা'ত প্রকৃতপক্ষে অতি দুঃসাহসের কাজ। বরং তা সুলতানের সঙ্গে সম্মুখ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া এবং শাসনকর্তার আনুগত্য থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করার শামিল। ....এই জঘন্যতম খবর আমার মধ্যে আলোড়ন এনে দিয়েছে, উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। আমার ফারুকী রক্ত টগবগিয়ে ওঠেছে। তাই এ কয়েকটি বাক্য লিখে দিলাম।"[১]

মুজাদ্দিদ সাহেবের এই জোস্-ই- ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সংস্কার আন্দোলনে এবং সুষ্ঠু কর্মধারায়। তিনি মাত্র সতের বছর বয়সেই যাবতীয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর আধ্যাত্মিকতার সবক নেন।

শরীয়ত ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সমাপনের পর মুজাদ্দিদ সাহেব আগ্রায় আগমন করেন। কয়েক বছর সেখানে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন। সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম রত্নদ্বয় আবুল ফজল ও ফৈজীও তাঁর ক্লাশে অংশ নিতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর থেকে উপকৃতও হতেন।

---

১. পত্র নং ১৫, ২য় খণ্ড

এই সময়ের এক ঘটনা। ঈদের চাঁদ নিয়ে এখতেলাফ চলছিল। শরীয়ত নির্ধারিত প্রমাণের পূর্বেই সম্রাট আকবর ঈদের ঘোষণা করে দেন এবং মানুষের রোযা ভাঙান। ঠিক ঐ দিন মুজাদ্দিদ সাহেব সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আবুল ফজলের নিকট যান। আবুল ফজল বুঝতে পারলেন যে, তিনি রোযা ভাঙেননি। আবুল ফজল কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব বললেন, চাঁদ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত শরীয়ত অনুযায়ী সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। কাজেই রোযা ভাঙার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এতে আবুল ফজল জবাব দিলেন,—"বাদশাহ স্বয়ং চাঁদ দেখেছেন।" মুজাদ্দিদ সাহেব অকস্মাৎ বলে ওঠলেন,—'বাদশাহ বে-দ্বীন, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'

এতে আবুল ফজল কিছুটা দমে গেলেন। কিন্তু তবুও তিনি পানি ভর্তি একটি গ্লাস উঠিয়ে নিলেন এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের মুখের কাছে তা তুলে ধরলেন। এতে মুজাদ্দিদ সাহেব ভীষণ রাগান্বিত হলেন। ধাক্কা মেরে তাঁর হাত দূরে সরিয়ে দিলেন এবং স্বীয় বাসভবনে ফিরে এলেন। আবুল ফজলকে বলে পাঠালেন, আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে সৌজন্য-মূলক আচরণ করা উচিত। তা শুনে আবুল ফজল খুবই লজ্জিত হলেন এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের কাছে মাফ চেয়ে নিলেন।

মুজাদ্দিদ সাহেবের আগ্রা আগমন এবং এখানে শিক্ষকতায় আত্ম-নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে সংস্কার আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যই তিনি আগ্রা এসে-ছিলেন। কারণ তখন মোগল-ভারতের রাজধানী ছিল দিল্লী। সারা ভারতের প্রাণ-কেন্দ্র ছিল এটি। এখানেই প্রথম সকল অনাচারের জন্ম হয় এবং এখান থেকেই পরে তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মুজা-দ্দিদ সাহেব অতি নিকটে থেকে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং ভবিষ্যৎ রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যেই কয়েক বছর আগ্রায় অবস্থান করেন। ফলে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল রাজধানীর যাবতীয় অনাচার প্রত্যক্ষ করা, এর গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করা এবং এ থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করা। তিনি বুঝেছিলেন শাসক গোষ্ঠীই যত অনাচারের

মূল। আরবীতে একটি প্রবচন আছে الناس على دين ملوكهم "জনগণ শাসকদেরই অনুসারী হয়ে থাকে।" কাজেই শাসক সম্প্রদায়ের সংশোধনই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই একটি পত্রে তিনি তুলে ধরেছেন। বলছেন,—

"সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাদশাহর সম্পর্ক ঠিক তেমনি,—যেমনি সম্পর্ক দেহের সাথে মনের। মন যদি ঠিক থাকে দেহও ঠিক থাকে। আর যদি মন বিগড়ে যায়—তাহ'লে দেহেও বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং বাদশাহর সংশোধন সাম্রাজ্যেরই সংশোধন। আর তার বিপর্যয় সমগ্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসেরই নামান্তর।"[১]

বাদশাহর ধর্মদ্রোহিতা ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি তাঁর বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করার পর মুজাদ্দিদ সাহেব প্রথমেই শাসক পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারতেন,—এজন্য পরিকল্পনা করতে পারতেন এবং এ পথে সফল হওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ শাসক পরিবর্তনের চাইতে শাসকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনই একজন সংস্কারের প্রথম কাজ,—এটা তিনি জানতেন। এবং জানতেন বলেই, এখান থেকেই তিনি কাজ শুরু করেন। ফলে দেখা দেয় শাসক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর তীব্র সংঘাত। সংঘাত নতুন কোন কিছু নয়। এ সংঘাত চির পুরাতন এবং চিরন্তন। আবহমান কাল ধরে আম্বিয়ায় কেরাম, তাঁদের অনুসারীরা এবং প্রত্যেক মুজাদ্দিদের কায়েমী স্বার্থবাদিদের সংঘর্ষের সূত্রপাত এখানেই।

মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচী ঃ

ক. বে-সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংশোধন
খ. উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাদের সংশোধন
গ. বাদশাহর সংশোধন

এ সময় দেশ পরাধীন ছিল না। তাই বিদেশী শক্তির উৎখাত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন প্রশ্নও ওঠে না। বাদশাহ এদেশী ছিলেন। জনগণও নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করতেন। তাই মুজাদ্দিদ সাহেব

---

১. পত্র নং ৪৭ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫

এই কর্মপন্থা নির্ধারণ করলেন। সাধারণ জনগণ, সম্রাটের সভাসদ, উপদেষ্টা ও আমলা এবং স্বয়ং বাদশাহ যদি ইসলামী আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন, ইসলামী জ্ঞান ও ইসলামী চরিত্র দ্বারা সমৃদ্ধ হন, তাহ'লে তাঁরাই উঠে পড়ে লেগে যাবেন এদেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায়, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং ইসলামী শাসন প্রবর্তনে। শুরু হয়ে যাবে ইসলামী বিপ্লব, দেখা দিবে ইসলামী রেনেসাঁ, সফল হবে তাঁর সংগ্রাম।

কয়েক বছর পর মুজাদ্দিদ সাহেব আগ্রা থেকে সারহিন্দ ফিরে আসেন। তার ওয়ালেদ সাহেব তখনো জীবিত। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানেও কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ চালিয়ে যান। এর মধ্যে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন (১০০৭ হিঃ)। মুজাদ্দিদ সাহেব শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। মক্কা শরীফ যাওয়ার মনস্থ করেন। এসময় তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর। মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে তিনি দিল্লী এসে উপস্থিত হন। ভারত-বিখ্যাত পীরে কামেল হযরত বাকীবিল্লাহ (রঃ) তখন দিল্লীতেই অবস্থান করছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর দরবারে এলেন-মুরীদও হলেন। কিছুদিন সেখানে থাকলেন। এরপর বিদায় চাইলেন। কিন্তু তাঁর উপর তখনও হজ্ব ফরয হয়নি। তাই মক্কা শরীফ যাওয়ার অনুমতিও পীর সাহেব থেকে পাননি। বরং পীর সাহেব নির্দেশ দিলেন আগে এমন এক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে—যা তখন তার উপর ফরয হয়ে গিয়েছে। তখন দেশে ইসলাম দ্রোহিতা, ধর্মীয় অনাচার, সামাজিক কুসংস্কার, রাজনৈতিক অনাচার এবং অর্থনৈতিক অত্যাচার চলছে। এর বিরুদ্ধে জিহাদ করাই তাঁর আশু কর্তব্য। হযরত বাকীবিল্লাহ্ (রঃ) তাঁকে এই কর্তব্য স্মরণ করিয়া দিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেবও তা শিরোধার্য করে নিলেন।

জিহাদ—বিরাট জিহাদ। সংগ্রাম—শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম। দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমত—সবচেয়ে বড়ো খেদমত। বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে মানুষের চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে, নৈতিকতা ও তামাদ্দুনে, রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায়, সমাজ ও অর্থনীতিতে এক কথায় মানব-জীবনের সকল দিকে। এজন্য একমাত্র পাথেয় হলো আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং

দৃঢ় মনোবল। আর এসবই পুরোমাত্রায় মুজাদ্দিদ সাহেবের ছিল।

মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর তিন দফা কার্যসূচীর প্রথম দফার প্রতি সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করেন। আগ্রা সারহিন্দে তাঁর শিক্ষাদান কার্যও এ উদ্দেশ্যই ছিল। আর এতে তিনি বিরাট সফলতাও অর্জন করেছিলেন। জনগণের এক বিরাট অংশ তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়—তাঁর হাতে বয়াত হয়, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করে। তিনি তাদেরকে একই উদ্দেশ্যের জন্য গড়ে তোলেন এবং সুসংগঠিত করেন। মুজাদ্দিদ সাহেবের একটি পত্রে এই সফলতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে শেখ ফরীদের কাছে তিনি এই পত্র লিখেন। তাতে বলছেন,—

"ইসলামী হুকুম প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর পতন এবং ইসলামের বাদশাহর সিংহাসনারোহণের শুভ সংবাদ এইমাত্র বিশিষ্ট ও সাধারণ নাগরিকদের গোচরীভূত হয়েছে। তাই আজ মুসলমানরা নিজেদের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন তাঁরা বাদশাহর সাহায্য ও সহায়তা করবে এবং শরীয়তের হুকুম জারী ও মিল্লাতের শক্তিবৃদ্ধির কাজে তাঁর পথ-নির্দেশ করবে। এই সাহায্য-সহায়তা এবং শক্তিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা কথায় সম্ভব হোক কিংবা শক্তি প্রয়োগে।"[১]

এ থেকে বোঝা যায় মুজাদ্দিদ সাহেব এজন্য একটি বিশাল বাহিনী তৈরী করেছিলেন, এতে অগণিত বিশিষ্ট জ্ঞানী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি যেমন ছিলেন, তেমনি অসংখ্য সাধারণ মানুষও যোগ দিয়েছিলেন। এঁরা সরকার পরিবর্তন অথবা হুকুমতের সংশোধনের জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলেন।

শেখ ফরিদ শাহী দরবারের একজন প্রভাবশালী সদস্য। আকবরের আমলে তিনি মীর মুনশী ছিলেন। জাহাঙ্গীর তখ্‌তে আসীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম তাঁকেই পুরস্কার ও বিশেষ পদমর্যাদা দান করেন। শাহজাদা খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাঁকে শায়েস্তা করার ভার জাহাঙ্গীর শেখ ফরিদের উপরই অর্পণ করেন। সম্রাট লাহোর পৌঁছার আগেই শেখ ফরিদ তাঁর ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে

১. পত্র নং ৪৭, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৫

খসরুর বিশাল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেন। বাদশাহ তাঁর বাহিনী সহ লাহোর পেঁীছে এ খবর শোনেন এবং শেখ ফরিদকে "ওয়ালায়ে মুর্তজা খান" খেতাব দেন। শেখ ফরিদ মুজাদ্দিদ সাহেবের ভক্ত ছিলেন, তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের সংস্কার-আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ১০১৪ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় মুজাদ্দিদ সাহেবের বয়স ছিল ৪৩ বছর। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অগণিত লোক তাঁর আন্দোলনে শরীক হয়েছিল। দুর্বার তাঁদের গতি, অমিত তাঁদের শক্তি, পরিশুদ্ধ তাঁদের চরিত্র, প্রবল তাঁদের ব্যক্তিত্ব। সুদৃঢ় সুসংবদ্ধ সংগঠনে তাঁরা আবদ্ধ। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধীনে সুষ্ঠু কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের কর্তব্য কাজ আদায় করে যাচ্ছেন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্ম-জীবনীতে বলছেন,—

"প্রত্যেক শহর ও পল্লীতে এক একজন করে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে রেখেছে। যাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, একাগ্রচিত্ত ও বজ্রকঠোর।" (পৃঃ ২৭৫)

বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের ন্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায়েও মুজাদ্দিদ সাহেব সম্পূর্ণ কামিয়াব হন। তাঁর পত্রাবলী পাঠে জানা যায়—জাহাঙ্গীরের দরবারে সুন্নী মতাবলম্বী বিশিষ্ট সদস্য যাঁরা ছিলেন—এদের সবাইকে তিনি আপন মতে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। দরবারের বিশিষ্ট সদস্য খান খানান, খান জাহান, খান আজম, খাজা জাহান, মিরজা দারাব, কলিজ খান, নবাব সৈয়দ ফরিদ প্রভৃতি সবাইর নামেই মুজাদ্দিদ সাহেব পত্র লিখেছিলেন। এসব পত্রে লেখার ধরণ দেখলেই বলা যায় যে, আপন মতাবলম্বী দীক্ষিত ব্যক্তি, একই উদ্দেশ্যের অনুসারী এবং নেহায়েত আপনজনের কাছেই এসব পত্র লেখা হয়েছে।

এঁরা সবাই জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যের এক একটি স্তম্ভ ছিলেন। তাঁদের প্রভাব তাঁদের মান-মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে ছিল। আবদুর রহীম খান খানান আকবরের আমল থেকে এত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ছিলেন যে, মনে হতো তিনিই অর্ধেক সাম্রাজ্যের মালিক।

তিনি স্বয়ং বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ করেন। জাহাঙ্গীর তাঁর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। এমন কি সম্রাটের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহও ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তবুও জাহাঙ্গীর সব সময় তাঁকে ভয় করে চলতেন। খান খানান মুজাদ্দিদ সাহেবের নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। মুজাদ্দিদ সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তাঁকে পত্র লেখেন। তিনি বৈরাম খানের পুত্র ছিলেন। জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনীতে জানা যায়—খান খানান আরবী, ফারসী, তুর্কী ও হিন্দী, ভাষায় বিশেষ দক্ষতা রাখতেন। দৃঢ় মনোবল বিশেষ যোগ্যতা, দুর্দান্ত সাহসিকতা, অসীম বীরত্ব এবং গভীর জ্ঞান ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি।

দারাব খান, খান খানানের পুত্র ছিলেন। তিনি শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় তিনি শাহজাহানের পক্ষাবলম্বন করেন এবং শাহী ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে তিনি মারাও যান।

বস্তুত শাহী দরবারের এসব বিশিষ্ট সদস্যের সবাই গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ছিলেন। আকবরের আমল থেকে দরবারে এদের বিশেষ আধিপত্যও বিদ্যমান ছিল। মুজাদ্দিদ সাহেব এদেরকে স্বীয় মতে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন। কিরূপ অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব থাকলে মোগল রাজ-দরবারে ভাবধারা পুষ্ট সভাসদ ও আমীর উমরাহ্‌দেরকে মুজাদ্দিদ সাহেবের ন্যায় রাজকীয় ক্ষমতাহীন একজন নিঃস্ব লোকের পক্ষে স্বীয় মতে আনা এবং দীক্ষা গ্রহণ করানো সম্ভব হয়—তা সহজেই অনুমেয়।

মুজাদ্দিদ সাহেব সম্রাট আকবরের আমলেই তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। এই সময় প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজও অনেক দূর এগিয়ে যায়। আকবর ১০১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং জাহাঙ্গীর তখ্‌তে আসীন হন। এই সময়টিকেই মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন। সম্রাটের সভাসদদের মধ্যে এ পর্যন্ত যাঁরা সংস্কার আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন—তাঁদের

নিয়েই তিনি কাজ আরম্ভ করেন। চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁদেরকে এ কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করার আহ্বান জানান, এর জন্য উৎসাহিত করেন এবং বিপ্লবের ধারা বুঝিয়ে দেন। এসব পত্রে মুজাদ্দিদ সাহেবের বিপ্লবী জীবনধারা ও সমসাময়িক কালের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। শেখ ফরিদের কাছে তিনি লিখছেন,—

"সাম্রাজ্যের সাথে বাদশাহর সেই সম্পর্ক দেহের সাথে যে সম্পর্ক মনের। সুতরাং বাদশাহর সংশোধন সাম্রাজ্যেরই সংশোধন এবং বাদশাহর বিপর্যয় সাম্রাজ্যেরই বিপর্যয়।

"আপনি বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, ইতিপূর্বে (আকবরী আমলে) মুসলমানদের উপর দিয়ে কি ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছিল। কাফেররা প্রকাশ্যে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে দারুল ইসলামে (ভারতে) কাফেরী মতবাদ ও বিধি জারী করতো। আর ইসলামী আহকাম জারী করতে মুসলমানরা ছিল অক্ষম। কেউ যদি তা করতো—তবে তাকে হত্যা করা হতো। এটা কত ঘোর বিপদ ছিল যে, মহানবীর (সঃ) অনুসারীরা হতো লাঞ্ছিত। আর তাঁর অস্বীকারকারীরা পেত সম্মান। মুসলমান আহত হৃদয়ে ইসলামের জন্য শোক ও বিলাপ করতো। আর ইসলামের দুশমন ও বিদ্বেষ পোষণকারীরা একে উপহাস করতো, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিত।

"আজ ইসলামের বাদশাহর সিংহাসনে আরোহণের শুভ সংবাদ যখন সর্ব-সাধারণের কানে এলো—তখন মুসলমানরা শরীয়তের আইন জারী এবং জাতির শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাদশাহর সাহায্য ও সহায়তা করা নিজেদের উপর ফরয ও অপরিহার্য করে নিল। এজন্য যে কোন প্রকার সাহায্য করতে তারা ইতস্তত করবে না।

"শরীয়তের যাবতীয় বিধানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা, এবং কুরআন, সুন্নাহ, ও ইজমা অনুযায়ী আকায়েদের সব বিতর্কিত বিষয়ের প্রকাশ ও ঘোষণা রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান সাহায্য। তাহ'লে কোন বেদা'তী বা গোমরাহ ব্যক্তি হঠাৎ মাঝখানে এসে বাদশাহকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না—ব্যাপারও বিগড়ে যাবে না।

"এ ধরনের সাহায্য করা সত্যপন্থী আলেমদেরই একমাত্র অধিকার যাঁদের মূল লক্ষ্য পরকাল। কিন্তু বৈষয়িক ও পার্থিব স্বার্থই যে-সব আলেমের স্থির লক্ষ্য—তাদের সংসর্গ গরল-তুল্য। তাদের বিপর্যয়ই চরম ধ্বংস ডেকে আনছে।

যে আলেম বৈষয়িক উন্নতি ও লোভ-লালসায় মত্ত, সে স্বয়ং পথভ্রষ্ট, অন্যকে কি করে দেবে সে পথের সন্ধান? বিগত আমলে যে দুর্বিপাক এসেছিল—তা এই দলের অশুভ ক্রিয়াকর্মের কারণেই। এরাই বাদশাহদের সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। এদেরই কারণেই ইসলামে ৭২ ফেরকার সৃষ্টি হয়েছে। যারা আলেম নয় তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হলে—তাদের ভ্রষ্টতা অন্যদেরকে ধ্বংস করে না। এ-যুগের অধিকাংশ সুফীবেশী মূর্খদেরও ঠিক একই অবস্থা। তাদের অনিষ্টকারিতা অন্যদের পর্যন্ত প্রভবান্বিত করছে।

"যদি কোন ব্যক্তি সর্বপ্রকার সাহায্যের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এতে কোনরূপ ভুল ও অবহেলা করে—সে ইসলামের কারখানার ক্ষতি করে। নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্‌র কাছে দোষী ও দায়ী হবে। একারণেই এই অধম ও (মুজাদ্দিদ সাহেব স্বয়ং) ইসলামী হুকুমতের সহায়তা-কারীদের দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় এবং যথাসম্ভব খেদমতের বাসনা রাখে। من كثر سواد قوم فهو منهم অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন দলের পরিসীমা সম্প্রসারণ করে—সে তারই অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে যখন বিক্রি করার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল—তখন এক বৃদ্ধাও সামান্য সুতা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেল। উদ্দেশ্য হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ক্রেতাদের দলে শামিল হওয়া যায়। এই ছিল তার সমস্ত পুঁজি। আমিও নিজেকে ঠিক অনুরূপই মনে করি।

হাঁ, বাদশাহর সাথে যখন আপনার পূর্ণ ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান এবং বাদশাহর সর্বপ্রকার সাহায্য করতে আপনি সক্ষম—তখন এই আশা আছে যে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সর্বপ্রকারে ইসলামী বিধান-জারী ও প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং মুসল-

মানদেরকে এই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন।"[১]

বাদশাহর পাত্র মিত্র ও অমাত্যদের মধ্যে যাঁরা মুজাদ্দিদ সাহেবের জামায়াতে শামিল হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ ফরিদই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁকে দ্বীনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলেন ও উৎসাহ দেন। এক পত্রে মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁকে লিখছেন,—

দ্বীন প্রচার এবং জাতিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো সর্বযুগে সকলেরই জন্য উত্তম কাজ। কিন্তু বর্তমানে ইসলামের এই অসহায় অবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং জাতির সাহায্যে এগিয়ে আসা আপনার ন্যায় 'আহলে বয়েত,—এর (রসূল সঃ,-এর বংশের) যুবকদের উপর ফরয। এটা এক মাত্র আপনাদের ন্যায় লোকদেরই কাজ। কারণ এই মহামূল্যবান সম্পদের আবির্ভাব আপনাদেরই পবিত্র বংশ থেকে ঘটেছে। অন্যরা আপনাদের থেকেই তা পেয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমাময় খেদমতের আহকাম দেয়াই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রকৃত ও সত্যিকার ওয়ারিশ হওয়ার প্রমাণ। এটাই সেই যুগ, যে যুগ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, —

"আজকের যুগ এমন যে, এ সময় তোমরা যদি আদেশ-নিষেধের এক দশমাংশও ছেড়ে দাও, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর এমন এক যুগ আসবে - তখন যদি দশ ভাগের একভাগও মেনে চলে, তা হ'লেও মুক্তি ও নাজাত পেয়ে যাবে।"

মুসলমানদের বাদশাহর দৃষ্টি কাফেরদের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না। মুসলমানদের কর্তব্য, কাফেরী সংস্কার ও রীতি-রেওয়াজের অপকারিতা সম্পর্কে বাদশাহকে পূর্ণভাবে অবহিত করা। প্রয়োজনবোধে একজন আলেম ডাকা উচিত। শরীয়তের বিধান প্রচারের জন্য কেরামতী ও অলৌকিক কিছুর প্রকাশ জরুরী নয়। দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করা ও অবহিত হওয়া এবং ঘোষণা ও প্রচারের কারণে কোন দল যদি অসহনীয় দুঃখ-কষ্টও নির্যাতনের শিকার হয়—তবে তা তার যথার্থ সৌভাগ্য।

১. পত্র নং ৪৭ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫-৬৬

কেন, নবীগণ কি এ পথে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেননি? রসূলুল্লাহ (সঃ) তো এমনও বলছেন,—

"যে পরিমাণ দুঃখ কষ্ট আমাকে দেয়া হয়েছিল, অন্য কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি।"[১]

মুফতী সদরজাহান এক বুজুর্গ ব্যক্তি। আকবর মৃত্যুকালে তাঁকে কালেমায়ে শাহাদত পড়ানোর জন্য মুফতী সাহেবকে ডেকে আনান। তিনি রসূল (সঃ)-এর বংশধর ছিলেন। আকবরের আমলে দীর্ঘদিন ফতোয়া বিভাগের প্রধানও ছিলেন। জাহাঙ্গীরও তাঁকে যথারীতি একই পদে নিযুক্ত রাখেন। এ ছাড়া তাঁর ক্ষমতার পরিধি অধিক বাড়িয়ে দেন। বাদশাহকে সেজদা দেয়া থেকে অব্যাহতি দিয়ে জাহাঙ্গীর তাঁর ধর্মীয় মর্যাদা রক্ষা করেন। মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁকে লিখছেন,—

"একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে الناس على دين ملوكهم (মানুষ তাদের রাজা-বাদশাহদের অনুকরণ করে) সুতরাং জনসাধারণের সংশোধনের জন্য সুলতানদের সংশোধন অপরিহার্য। বর্তমান বাদশাহর মধ্যে পূর্ববর্তী বাদশাহর ন্যায় মুসলিম জাতির প্রতি ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঘৃণা দেখা যায় না। সুতরাং মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানরা এবং ওলামায়ে কেরামের কর্তব্য, পবিত্র শরীয়তের প্রচলনে সব উদ্যম ও সাহস প্রয়োগ করা এবং প্রথমেই ইসলামের খুঁটিগুলোকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া। এতে কখনো বিলম্ব করা উচিত নয়।

এই বিলম্বের কারণে অধম (মুজাদ্দিদ সাহেব) অন্তঃকরণ খুবই উদ্বিগ্ন। পূর্ববর্তী আমলের স্মৃতি অন্তরে এখনো জাগরূক। দুর্ভাগ্যক্রমে এর প্রতিবিধান যদি না হয়—তাহ'লে দ্বীনের সাথে এই অপরিচয় আরো দীর্ঘ হয়ে যাবে।

মহামান্য বাদশাহ যদি শরীয়তের বিধানজারীর প্রতি মনোযোগী না হন,—আর তাঁর ঘনিষ্ঠ সভাসদরাও নিজেদেরকে ক্ষমার উপযুক্ত ও দায়িত্বমুক্ত ভাবেন এবং সামান্য কয়েকদিনের জীবনকেই মূল্যবান মনে করেন—তাহ'লে নিঃসন্দেহে তা অসহায় মুসলমানদের জন্য ভীষণ দুঃখের কারণ হয়ে পড়বে।"[২]

---

১. পত্র নং ১৯৩, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৯৩-৯৪

২. পত্র নং ১৯৪ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৯৫

খান আজম আকবরের দুধভাই। খানে খানান তাঁর ভগ্নী-পতি। আকবরের আমীর-উমারাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে আসীন ছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব তাকে লিখছেন,—

"রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, অপরিত ও আগন্তুক বেশেই ইসলামের আবির্ভাব। অচিরেই তা অপরিচিত হয়ে যাবে—যেমন হয়েছিল শুরুতে। সুতরাং তাদের মোবারকবাদ ইসলামের জন্য যারা প্রবাসী হয়। ইসলামের দুর্দশা ও অসহায় অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কাফেররা প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি কটূক্তি ও অশ্লীল মন্তব্য করছে,—মুসলমানদের কুৎসা বয়ান করছে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে কাফেরী মতবাদ চালু করেছে। হাটে, বাজারে, শহর, গঞ্জে কাফেরদের স্তুতি কীর্তন করে ফিরছে। ইসলামের বিধি-বিধান চালু করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন করতে চাওয়া তারা আজ অপরাধী ও অভিযুক্ত।......

আল্লাহ্ পাক ও পবিত্র, সব প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। কথিত আছে الشرع تحت السيف (শরীয়ত হলো তলোয়ারের ছায়ার নীচে) শরীয়তের বিধি-বিধানের গৌরব ও সৌন্দর্য সুলতানদের সাথে সম্পৃক্ত বলে স্বীকৃত। কিন্তু এখানে ব্যাপার ঠিক তার উল্টো। হায় আফসোস! হায় দুঃখ!!

"বর্তমানে আপনার বিদ্যমান তা একটি সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা যারা এই সংগ্রামে দুর্বল ও পরাজিত, শুধু আপনাকেই জানি। মহান আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।

"মহানবী (সঃ) বলেছেন, "ঈমান ঠিক তখনই পরিপূর্ণ হবে—যখন মানুষ মু'মেনকে পাগল বলা শুরু করবে।" সেই পুণ্যময় পাগলামী-যার মূল লক্ষ্য ইসলামী তেজস্বিতা এবং পূর্ণস্তরের ইসলামী আত্ম-সম্মান-বোধ,— তা আপনার মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। আলহামদুলিল্লাহ্।

"এটা সেই জামানা, যাতে সামান্য কাজের মূল্যও সর্বাধিক। আস-হাবে কাহাফ' সে যুগে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিল। তাঁদের এই কাজ আল্লাহ্‌র দরবারে স্ব-সম্মানে গৃহীত। শত্রুর বিজয় ও সংখ্যা-ধিক্যের সময় পরাজিত কোন সৈনিক যদি সামান্যতম প্রয়াসও চালায়

তাহ'লে এ অনেক বেশী গুরুত্বের অধিকারী হয় এটা জাতীয় জিহাদ, আল্লাহ্ আপনাকে এর তৌফিক দিয়েছেন। এটা জিহাদে আকবর। (শ্রেষ্ঠ জিহাদ) এটাকে মহামূল্যবান বলে জানুন এবং যথাশক্তি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

মুজাদ্দিদ সাহেবের অপর এক পত্রে নকশবন্দীয়ার প্রতিষ্ঠাতা পীর হজরত খাজা আহারার (রঃ)-এর কর্মধারা বর্ণনা করেন। তিনি বাদশাহ ও আমীর উমরাদের নিকট গিয়ে স্বীয় চরিত্রের মাধ্যমে তাঁদের মন আকৃষ্ট করতেন। এতে তাঁরা খুবই মুগ্ধ-হতেন এবং খাজা সাহেবের কথা শুনতেন। খাজা সাহেব এভাবে তাঁদের সংশোধন করতেন এবং দ্বীনের প্রতি তাঁদের আকর্ষন বাড়াতেন। মুজাদ্দিদ সাহেব লিখছেন,—

"অনুরোধ এই যে, সেই বুজুর্গ খান্দানের মহাপুরুষ ও মনিষীগণের প্রতি আপনার প্রগাঢ় ভালবাসা রয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছেন। আপনার সম-সাময়িক লোক এবং বন্ধু-বান্ধবের দৃষ্টিতে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ আপনার হাড়-মাংসের সাথেই মিশে আছে। তাই ইসলামের জন্য আপনিও অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা চালাতে থাকুন। যেসব কাফেরী বিধান মুসলমানদের প্রতি সংকীর্ণতা ও ধর্মের প্রতি অনীহাভাবের সৃষ্টি করেছে, তার মূলোৎপটন করার ক্ষমতা আপনার আছে। সমস্ত নির্মূল করা সম্ভব না হলেও অন্ততঃ যেন অধিকাংশ বাতিল হয়ে যায় এবং এসব অন্যায় বিধি-বিধান ও অনাচার থেকে মুসলমানরা অব্যাহতি পায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যান। বিগত বাদশাহর আমলে ইসলামের প্রতি বিরাগ বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। মনে হয়, বর্তমান বাদশাহর মধ্যে প্রকাশ্যত তা নেই। যদি থেকেও থাকে তবে তা ইসলামী বিধান সম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞান থাকার কারণেই আছে যা হোক ক্রমান্বয়ে আবার সেই বিরাগও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া এবং মুসলানদের সেই দুর্দশা পুনঃ দেখা দেয়ার আশংকা নিশ্চয় রয়েছে।"[১]

খান জাহান আকবরের আমলে পাঁচ হিজরী মনসবদার ছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে আরও প্রতিপত্তি লাভ করেন। উভয় সম্রাটের

---

১. পত্র নং ৬৫ ১ম খন্ড পৃঃ ৮২-৮৩

আমলেই তিনি সাম্রাজ্যের বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দেন। মুজাদ্দিদ সাহেব ইসলাম কায়েমের সংগ্রামে তাকেও নিয়োগ করেন। তাঁকে লিখছেন,—

"অস্থায়ী দুনিয়ার সকল সম্পদ সম্ভোগের বস্তু এবং অনুগ্রহরাজী উপাদেয় ও সুখকর,—যদি শরীয়ত অনুযায়ী তা উপার্জিত ও ব্যবহৃত হয়। অন্যথায় তা প্রাণনাশী গরলমিশ্রিত মধুতুল্য। এটা দ্বারা অজ্ঞদের-কেই ধোঁকা দেয়া যায় মাত্র।"

"দুনিয়ার এই সম্ভোগের বস্তুকে পরিশোধন ও গরলমুক্ত করনের একটি মাত্র পথই আছে। আর তা হলো, মহাবিজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্‌প্রদত্ত দাওয়াই দ্বারা তার চিকিৎসা করা। অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-বিধানের তিক্ত ও সুমিষ্ট-এই উভয় দিকের আস্বাদন দ্বারা এর প্রতিবিধান করা যায়,—তা'হলে সহজসাধ্য ও অনায়াসলব্ধ এই বিধানের স্বল্প প্রয়োগেই একটি স্থায়ী ও অনন্ত দুনিয়া অর্জিত হওয়া সম্ভব।

"যা হোক! বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার সাথে লক্ষ হাসিল করা কর্তব্য। অবোধ ছেলেদের ন্যায় বাদাম ও আখরোটের লোভে অন্য কিছুর শিকার না হওয়া উচিত।

"এই খেদমত সামনে সমুপস্থিত। যদি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীয়ত অনুসরণের মাধ্যমে তা করে যান, তবে যেন নবীগণের দায়িত্বই আঞ্জাম দিলেন এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকেই উজ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

আমাদের ন্যায় অক্ষম ও অধম ব্যক্তিরা যুগ যুগ ব্যাপীও যদি সর্বাত্মক সাধনা চালিয়ে যাই,—তথাপি আপনাদের মত সিংহপুরুষদের সমপরিমাণ কাজ কখনো করতে পারবো না।"[১]

খানজাহানের কাছে লেখা অপর এক পত্রে মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁকে অত্যন্ত সুললিত ও সুমার্জিত ভাষায় আকায়েদ ও ইবাদত সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন। পত্রটি পড়লে মনে হয়, মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁকে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আত্মনিয়োগের জন্য তৈরী করছেন। পরিশেষে লিখছেন,—

---

১. পত্র নং ৫৪, ৩য় খন্ড

"বর্তমান বাদশাহ উর্ধ্বতন শত পুরুষ ধরে সুন্নী হানাফী মুসলমান। বর্তমান যুগটি অনাচার ও খারাবীর খুবই কাছাকাছি এবং নবীর যুগ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এযুগের জনকয়েক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে বাদশাহ এবং আমীর-উমরাহ্‌বর্গের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছে। স্বার্থসিদ্ধিই এঁদের আসল লক্ষ্য। এজন্য এই স্বার্থ-বাদীরা সর্বদা তাঁদের তোষামোদ ও চাটুকারিতায় লেগেই আছে। এরাই পবিত্র দ্বীন সম্বন্ধে নানারূপ দ্বিধা-সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, এবং সরল বিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে ছেড়েছে।

"এমন মহাপরাক্রমশালী সম্রাট যখন স্থির চিত্তে ও ধৈর্য সহকারে আপনাদের বক্তব্য শোনেন, এবং তা মেনে নেন, তবে আর অপেক্ষা কিসের? লক্ষ্য সাধনের এটাই তো সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগে 'আহ্‌লে সুন্নাত অল জামায়াতে'র আকায়েদ অনুযায়ী সত্য ও ন্যায্য কথা সুস্পষ্টভাবে কিংবা ইংগিতে বাদশাহকে বলে যান। সর্বদা বলার সুযোগের অপেক্ষায় থাকুন; সুযোগে সমুপস্থিত হওয়া মাত্রই ইসলামের সৌন্দর্য এবং কাফেরীর অপকারিতা ও অনিষ্টের দিকগুলো তাঁর নিকট মূর্ত করে তুলে ধরুন।.........

"শাসনকর্তা হলেন আত্মা, সকল মানুষ তার দেহ। শাসনকর্তার সংশোধনের প্রয়াস সমগ্র বনি আদমের সংশোধনের প্রয়াসেরই নামান্তর। সংশোধন,—এটাই যে, যেকোন প্রকারে হোক, ইসলামের বিধি-বিধান-গুলোকে বাদশাহর মন ও মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দিতে হবে। এই মহান কাজ যার দ্বারা সাধিত হবে সে-ই নবীগণের যথার্থ ওয়ারিশ হবে। এই মহামূল্যবান সম্পদ আপনি বিনামূল্যেই পেয়ে যাচ্ছেন,—এর মর্যাদা রক্ষা করুন।"[১]

কালিজ খান সম্রাট আকবরের শ্রেষ্ঠতম জেনারেল ছিলেন। তিনি বীর, কৌশলী যোদ্ধা ও বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ছিলেন। সাথে সাথে ন্যায়বান, খোদাভীরু, বিদ্যানুরাগী ও কট্টর সুন্নী মতাবলম্বীও ছিলেন, লাহোরের সুবাদার থাকাকালীন মাদ্রাসায় দৈনিক এক ঘন্টা করে ফিকাহ্‌ তাফ-সীর ও হাদীস পড়তেন। তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের পীরভাইও

---

১. পত্র নং ৬৭, ৩য় খন্ড পৃঃ ১৩৩-৩৫

ছিলেন। ত্রিশ হাজারী মনসবদার ও পাঁচ হাজার খোড় সওয়ারীর অফিসার ছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব পবিত্রতা ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে নসীহত করার পর তাঁকে লিখছেন,—

"দ্বিতীয়ত আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কেননা, লাহোরের ন্যায় বৃহৎ নগরীতে আপনার উপস্থিতির কারণে শরীয়তের বহু বিধি-বিধান চালু হয়েছে, দ্বীনের শক্তি বেড়েছে, বিভিন্ন কাজে জাতি সহায়তা পেয়েছে। এই শহর অধমের দৃষ্টিতে সারা ভারতের সকল শহরের শিরোমণি বিশেষ। এই শহরের কল্যাণ ও বরকত ভারতের আর সকল শহরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এখানে যদি দ্বীন চালু হয়, তাহ'লে সর্বত্র তা চালু হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,—

"আমার উম্মাতের মধ্যে সবসময় একটি দল বিজয়ী হিসেবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা এর সাহায্য করবে না কিয়ামত পর্যন্ত তারা এর কোন ক্ষতিও করতে পারবে না।"[১]

জাহাঙ্গীরের দরবারের আমীর লালা বেগকে লিখছেন,—

"প্রায় এক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলো ইসলামের চরম দুর্দশা ও শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়েছে। ইসলামের দুশমন কাফেররা এখন ইসলামী শহরগুলোতে প্রকাশ্যে কুফরী প্রথা ও রীতি-নীতি চালু করছে। কিন্তু এত করেও সন্তুষ্ট হচ্ছে না। বরং তাদের একান্ত কামনা ইসলামী বিধান সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে যাক; ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির নাম-নিশান একেবারে মুছে যাক।

"ব্যাপারটি এতটুকু পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, যদি কোন মুসলমান থেকে ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তা হ'লে তাকে হত্যা করা হয়।

"গরু জবাই ইসলামের এক বিরাট নিদর্শন। হিন্দুরা জিজিয়া দিতেও রাজি। কিন্তু গরু জবাই করার অনুমতিদানে কখনো রাজি নয়। এই

---

১. পত্র নং ৭৬, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৬

বাদশাহর শাসনামলের শুরুতেই যদি ইসলামী বিধি-বিধান চালু হয়ে যায় এবং মুসলমানরা আধিপত্য কায়েম করে নেয় - তবেই উত্তম। তা না হ'লে সামান্যতম বিলম্বের কারণে মুসলমানদের পক্ষে কাজ করাই কঠিন হয়ে পড়বে। এ থেকে বার বার আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই।

"আমি দেখতে চাই, কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি এই সৌভাগ্যের জন্য ইস্পাত-কঠিন মনোভাব নিয়ে প্রস্তুত হন এবং কোন্ সিংহপুরুষ এই মহা-মূল্যবান সম্পদ হাসিল করেন।"[১]

এ ছাড়া মুজাদ্দিদ সাহেব সরকারের অন্তর্ভুক্ত আরো বহু প্রতাপ-শালী ব্যক্তিদের কাছেও অনুরূপ পত্র লিখেছিলেন। পাঠিয়েছিলেন দেশের বহু সামরিক অফিসার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছেও। এঁরা সবাই মুজাদ্দিদ সাহেবের মুরিদ ছিলেন। শাহী দরবারেও তাঁদের যাতায়াত ছিল। এঁদের সবাইকে তিনি একটি সুশৃংখল ও সুদৃঢ়বদ্ধ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব তিনি নিজে বহন করতেন। সরকারী লোকদের ছাড়া মুজাদ্দিদ সাহেব আরো কম-বেশী পাঁচ শো লোকের কাছে ছ শো একাত্তরটি পত্র লিখেছেন। তিন খণ্ডে বিভক্ত, হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থে তা সংকলিত। এসব পত্রপাঠে উপলব্ধি করা যায় যে, সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট, অভিজ্ঞ আলেম এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে তা লিখিত। এঁরাও মুজাদ্দিদ সাহেবের ন্যায় একই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন।

আকবর ইসলামের চরম সর্বনাশ করেছিলেন, এ ধারা জাহাঙ্গীরও অব্যা-হত রেখেছিলেন। আর ইসলাম-বিদ্বেষী হিন্দুরাও ইসলাম ও মুসলমানের ধ্বংস-সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে। ইসলাম ও মুসলমানের চরম বিপর্যয় মুজাদ্দিদ সাহেব স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মর্দে মুজাহিদ কেন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি এবং সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি? এ জিজ্ঞাসার উত্তর বিরাট। তবে অতি সংক্ষেপে এর কারণগুলো নিম্নরূপ বলা যায়।

---

১. পত্র নং ৮১ [illegible]

১. হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী কোন মুসলিম শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঠিক তখনই জায়েয, যখন প্রমাণিত হবে যে, তিনি প্রকাশ্যে কুফরীতে ও ইসলাম-দ্রোহিতায় লিপ্ত হয়েছেন। মুশরেকী ও কাফেরী কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়া যদিও হারাম তবুও কোন ব্যক্তিকে ঠিক তখনই কাফের ঘোষণা করা যায় যখন তাকে মুসলমান বলার মত আর কোন কারণই বিদ্যমান থাকে না। সম্ভবত আকবরের বিরুদ্ধে শসস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি মুজাদ্দিদ সাহেব তখনও অর্জন করতে পারেননি। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে জেহাদ ঘোষণার জন্য শর্ত হলো, এতটুকু বৈষয়িক শক্তি অবশ্য অর্জিত হতে হবে যদ্দ্বারা বিজয়ী ও সফল হওয়ার অন্তত কিছুটা আশা করা যেতে পারে। তা ছাড়া এও অসম্ভব নয় যে, মুজাদ্দিদ সাহেবের আন্দোলনে আকবরও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাই তো জীবন-সায়াহ্নে আকবরকে দেখা যায় তাওবা করতে।

২. মুজাদ্দিদ সাহেব আকবরকে স্বার্থপর ও ফাসেক মুসলমান বলতেন। অসাধু, চাটুকার ও স্বার্থপর লোকদের দ্বারা আকবর পরিবেষ্টিত ছিলেন। এজন্য আকবরের তুলনায় তিনি এসব স্বার্থপর আলেম, বিলাসপ্রিয়-অমাত্যবর্গ এবং চাটুকারদের সমালোচনাই বেশী করেছিলেন। সম্রাটের সংশোধনের জন্য তাঁর পারিষদদের সংশোধনকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাই তিনি নিজকে এ মহান সাধনার কাজেই নিয়োজিত রেখেছিলেন। আকবরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করার অবকাশ পান নি।

৩. সরকারের সংস্কার ও সংশোধনই যার একমাত্র লক্ষ্য সে রক্তাক্ত সংগ্রামকে ঠিক তখনই জররী মনে করে যখন এছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। ক্ষমতাসীনদের সংস্কার সাধনই মুজাদ্দিদ সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য যা করার দরকার ছিল সে কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সশস্ত্র জিহাদের সময় ও অবস্থা তখনো আসে নি।

৪. মুসলমান রাজা বাদশাহরা তখন পরস্পর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই অন্যের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা দুর্নীতিপরায়ণতাও বিলাসিতার দোহাই পাড়তেন এবং সংশোধনের দাবী জানিয়েই যুদ্ধ ঘোষণা

করতেন। ঠিক এই অবস্থায় মুজাদ্দিদ সাহেবও যদি সশস্ত্র জিহাদের ডাক দিয়ে বসতেন, তা হ'লে তাঁর এই ঘোষণাকেও ইব্রাহিম লোদী বনাম বাবর কিংবা হুমায়ুন বনাম শের শাহের সাথে সংঘটিত যুদ্ধের মতো একটা কিছু মনে করার অবকাশ ছিল। কারণ, শাহী দরবারের অমাত্য বর্গ, আমীর-উমারা সবাই এসব যুদ্ধের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে মুজাদ্দিদ সাহেবকেও অনুরূপ একজন মনে করা তাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই ছিল না, পরিণামে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার অভাবে তাঁর গোটা আন্দোলনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যেত।

তা ছাড়া, আকবরের অনুসৃত ধ্বংসাত্মক নীতির ফলে সাম্রাজ্যের উপর হিন্দু ও শিয়ারা বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছিল। তাঁরা অনুরূপ একটি আত্মঘাতী যুদ্ধ লাগার বা লাগানোর অপেক্ষায়ই ছিল। মুজাদ্দিদ সাহেব যুদ্ধ ঘোষণা করলে সেই সুযোগটি তাঁরা পেয়ে যেত। আর গোটা ভারত থেকে মুসলমানদের কর্তৃত্বই খতম হয়ে পড়তো।

এসব কারণে মুজাদ্দিদ সাহেব সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ পরিহার করেন এবং আগে সম্রাটের ঘনিষ্ঠ সহচর, সভাসদ, আমীর উমারা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংশোধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সত্যিকার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দেন।

কাফেরী ফতোয়া ও গ্রেফতারী

আল্লাহ্‌র দ্বীনকে দুনিয়ার প্রতিষ্ঠা করাই যাদের লক্ষ্য—তাঁদের জীবনে বহু ঝড় ঝঞ্ঝা আসা অবশ্যম্ভাবী। এপথের পথিক ছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম, মুজাদ্দিদ-ই-যমান, ইমাম ও খাঁটি আলেমবৃন্দ। কিন্তু কেউই এথেকে রেহাই পাননি। তাঁদের দ্বারাই একাজ করতে গিয়েছেন, করছেন কিংবা করবেন—তাঁরাই বিভিন্নরূপ সংঘাত-সংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, হচ্ছেন, এবং হবেনও। জেল-জুলুম, অত্যাচার নির্যাতন সবাইকে ভোগ করতেই হয়েছে। তাঁদের অনেকেই ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলেছেন, মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছেছেন। মুজাদ্দিদ-ই-আল-ফেসানী (রঃ) এপথের একজন পথিক। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক। তাই এসব প্রতিকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। মুজাদ্দিদ সাহেবের এই আন্দোলন,—নবীগণের আন্দোলন। তাঁর এই আহ্বান,—কুরআনেরই আহ্বান। কুরআন-সুন্নাহর জীবন্ত, ঝলন্ত ব্যাপক ও শাশ্বত শিক্ষাকে উপলব্ধি করারই আহবান। এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন জাহাঙ্গীরের দরবারের সৌভাগ্যশালী ও প্রভাবশালী সদস্য-বর্গ। এই আহ্বানে সাড়া দেন মুসলিম ভারতের বিশিষ্ট আলেম,—ওলামা এবং ফকীহ্‌গণও।

এই আন্দোলনের সফলতায় অনেকেরই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার পূর্ণ আশংকা ছিল। একে বরদাশ্‌ত করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ফলে আন্দোলনকে অংকুরেই বিনষ্ট করা এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের কন্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো।

১. সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বাসনা—তাঁর জামাতা শাহজাদা শাহ-রিয়ার যেন জাহাঙ্গীরের র সিংহাসনের অধিকারী হয়। তাঁর মোকাবিলায় রয়েছে ধার্মিক, যোগ্য ও সুন্নী মতাবলম্বী শাহজাদা শাহজাহান। আর তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন মুজাদ্দিদ

সাহেবের পুরো দল। এজন্য মুজাদ্দিদ সাহেব নূরজাহানের ঘোর শত্রু হলেন।

২. নাচ-গান এবং মদ আর মেয়ে নিয়েই শাহী দরবার ডুবে থাকতো,—বিলাস-ব্যসনে সবাই গা ঢেলে দিত। ব্যভিচার আর অনাচারে দরবার কলুষপূর্ণ। অথচ এসবের বিরুদ্ধেই ছিল মুজাদ্দিদ সাহেবের সংগ্রাম। এসবের প্রতি যাঁরা আসক্ত, তাঁরা কি করে এ আন্দোলনকে বরদাশ্‌ত করেত পারে? তাই তাঁরা এ মহান আন্দোলনের শত্রুই হলো।

৩. ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের এক মোক্ষম অস্ত্র হলো কাফেরী ফতোয়া। এর মাধ্যমে নেতার উপর থেকে মানুষের ভক্তিভাব কমানো যায়, মানুষকে দ্বিধান্বিত করা যায়। আর এভাবেই ইসলামী আন্দোলনের গতিরোধ করা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করে। একাজটি করা হয় খুবই সুসংগঠিত উপায়ে। চক্রান্ত-কারীরা ইসলামী আন্দোলনের নেতার রচনা ও বক্তব্যকে বিকৃত করে। সমসাময়িক বিশিষ্ট ও সর্বজনমান্য আলেমগণের খেদমতে তা পেশ করে। নেতার বিরুদ্ধে তাঁদেরকে বিদ্বিষ্ট করে তোলে। এসম্পর্কে তাঁদের থেকে ফতোয়া সংগ্রহ করে। সাধারণ্যে-এর ব্যাপক প্রচার চালায়। রাষ্ট্রীয় শান্তির জন্য শাসনকর্তার সাহায্য নেয়। মুজাদ্দিদ সাহেবও এর থেকে রেহাই পাননি। তাঁর বিরুদ্ধেও একই অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। এ কাজটিও সাধন করে সেই চক্রটিই। আর এর পুরোধা ছিলেন স্বয়ং মুজাদ্দিদ সাহেবেরই জনৈক মুরীদ হাসান খান আফগানী। হাসান খান কাবুলের অধিবাসী। মুজাদ্দিদ সাহেবের নিকট এসে মুরীদ হয়। একদিন তাঁর ও মুজাদ্দিদ সাহেবের অপর এক মুরীদের মধ্যে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এজন্য সে সম্পূর্ণ দায়ী করে মুজাদ্দিদ সাহেবকে। তাই মুজাদ্দিদ সাহেব থেকেই এর প্রতিশোধ নিতে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মুজাদ্দিদ সাহেবের অন্যান্য শত্রুরাও তাঁর সাথে এসে যোগ দেয়। চক্রান্ত শুরু হয়ে যায়। হাসান খানই এতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। সে মুজাদ্দিদ সাহেবের কোন কোন লেখায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের মাধ্যমে বিকৃতি ঘটায়। তাতে কাফেরী ও

খোদাদ্রোহিতামূলক অনেক বাক্য ঢুকায়। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অবমাননাকর ও রসূল (সঃ)-এর শানে অপবাদমূলক বহু কথার জাল বুনে এবং তা মুজাদ্দিদ সাহেবের লেখা বলে চালিয়ে দেয়। এরপর স্বয়ং হাসান খানই এসব বিকৃত লেখা মুসলিম ভারত ও আফগানিস্তানের সমসাময়িক বিশিষ্ট আলেম ও পীরদের কাছে পাঠায় এবং এসম্পর্কে তাঁদের ফতোয়া জানতে চায়। মুজাদ্দিদ সাহেব তখনও জীবিত। ফতোয়া দানের পূর্বে তার কাছে থেকেই এসব লেখা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য অবগত হওয়া কিংবা অন্য কোন উপায়ে এর সত্যাসত্য যাচাই করা আলেমদের উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। শুধু এক ব্যক্তির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই সাহাবীদের অবমাননা এবং রসূল (সঃ)-এর প্রতি অপবাদের জন্য মুজাদ্দিদ সাহেবকে দায়ী করেন এবং এই মর্মে মুজাহিদের বিরুদ্ধে কাফেরী ফতোয়া দিয়ে বসেন। তিনি 'মরদদ্' (দ্বীন বর্জনকারী) হয়ে গেছেন বলে রায়ও দেন। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক! প্রথম হাদীস চর্চাকারী, তাফ্‌সীর হক্কানীর ভাষ্যকার শ্রেষ্ঠতম আলেম শেখ আবদুল হক মুজাদ্দিসে দেহলভী (রঃ)-ও এ ব্যাপারে ধোকা খান এবং অনুরূপ ফতোয়াবাজীতে জড়িত হয়ে পড়েন। মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরুদ্ধে শুধু কাফেরী ফতোয়া দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি—মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরুদ্ধে তিনি বহু নিবন্ধ ও কয়েকটি পুস্তিকাও রচনা করেন।''[১]

৪. সুফী সম্প্রদায় তখন ''ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' (অদ্বৈতবাদ)-এ বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদ ইসলামের খেলাফ ছিল। তাই মুজাদ্দিদ সাহেব এর বিরোধিতা করেন এবং শরীয়ত অনুযায়ী এই মতবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন. এই মতবাদে বিশ্বাসী সুফী ও পীরগণ সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন। এই কঠোর অদৃষ্টবাদ ইসলামের সম্পূর্ণ খেলাফ। মুজাদ্দিদ সাহেব তা সংশোধন করে দেন এবং বলেন, "হামা উস্‌ত" নয় বরং "হামা আজ উস্‌ত" অর্থাৎ সবই তাঁর থেকে। এতে সুফী সম্প্রদায়ও তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য পরে যখন মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর পত্রের মূলকপি মওলানা

---

১. ওলামা হিন্দু কা শানদার মাজিয়ে মাজিয়ে পৃঃ ৩২৯।

আবদুল হক সাহেবের কাছে পাঠান এবং তাঁকে জানান যে, যে লেখার উপর ভিত্তি করে কোনরূপ খোঁজ খবর না নিয়ে ও সঠিক তথ্য অবগত না হয়ে আমার বিরুদ্ধে আপনি ফতোয়া দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে সেই লেখা আমার নয়। ওটা আমার জনৈক মুরীদেরই কল্পিত ষড়যন্ত্র। আসল ব্যাপার অবহিত হয়ে মওলানা আপন ভুল বুঝতে পারেন এবং তাঁর পূর্বমত পরিহার করেন ও ফতোয়া তুলে নেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই কু-চক্রীমহল স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়েছিল।

৫. শাহী দরবারের আলেমদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। তাছাড়া সাধারণ আলেম সমাজের যাঁরা দেশের রাজনৈতিক অনাচার ও দরবারী আলেমদের ব্যাভিচার এবং সরকারের ইসলাম-বৈরিতা ও কুফরপ্রিয়তা সর্বোপরি আল্লাহ্‌র জমিনে শয়তানের প্রভুত্ব চলতে দেখেও খানকাহ্‌ ও মাদ্রাসার চার দেওয়ালের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলেন এবং এটাকেই ইমান রক্ষার একমাত্র উপায় বলে মনে করলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁদের এই ভ্রান্তধারণার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে দরবারী ও সাধারণ আলেম সমাজ ও তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

৬. ইরানের শিয়া মতাবলম্বী বাদশাহর সাহায্যে হুমায়ুন দিল্লীর হারানো সিংহাসন ফিরে পান। ফলে দিল্লী রাজদরবারে ইরানী শিয়াদের প্রভাব বেড়ে যায়। এঁরা শিয়া মতবাদের রাফেজী সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁদের ধর্মীয় চিন্তাধারার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে কয়েকটি পুস্তিকা ও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এতে রাফেজী সম্প্রদায় ও তাদের সমর্থক সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মুজাদ্দিদ সাহেবের ভীষণ শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এসব কারণে যারা মুজাদ্দিদ সাহেবের শত্রুতে পরিণত হয় তারা ঐক্যজোট বেধে তাঁর উপর হামলা চালায়। তাঁর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরি মধ্যে ষড়যন্ত্র সফল করার একটি সুযোগও তারা পেয়ে যায়।

মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর পীর হজরত বাকী বিল্লাহ্‌ (রঃ)-এর কাছে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বলিত একটি পত্র লেখেন। কোন প্রকারে তা শাহী দরবারের তাঁর শত্রুদের হস্তগত হয় ষড়যন্ত্রকারীদের স্বার্থসিদ্ধির

হাতিয়ার মিলে যায়। অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ এই চক্রান্তকারীর দল পত্রটি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সামনে পেশ করে। এবং তাঁকে বুঝিয়ে দেয় যে, শেখ আহমদ নিজকে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে জানে এবং দাবী করে যে, তাঁর স্থান নাকি হজরত আবুবকর সিদ্দীকের (রাঃ) ঊর্ধ্বে।

সম্রাট এতে ভীষণ রুষ্ট হলেন। মুজাদ্দিদ সাহেবকে দরবারে তলব করলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর জওয়াব জানতে চাইলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব জওয়াব দিলেন,—

"হজরত আলী (রাঃ)-কেও যে ব্যক্তি হজরত আবুবকর (রাঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে—আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের মতে সে ব্যক্তি সুন্নী নয়। সুফী সম্প্রদায়ের মতে সে ব্যক্তি কখনো সুফী হতে পারে না—যে ব্যক্তি নিজেকে হীন প্রাণীর চাইতেও উত্তম মনে করবে। এসব জানা ও মানা সত্ত্বেও হজরত আবুবকর (রাঃ) থেকে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করা আমার পক্ষে কি করে সম্ভব? এরপর মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর পত্র ব্যাখ্যা করে সম্রাটকে বুঝিয়ে দেন। এতে জাহাঙ্গীর খুবই সন্তুষ্ট হয়ে যান। শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে বাদশাহ তাঁর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন। এই ব্যর্থতার গ্লানি শাহী দরবারের চক্রান্তকারীদল ও স্বার্থপর আলেম-সমাজের অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিশোধ স্পৃহায় তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে পরামর্শক্রমে তাঁরা এজন্য আর একটি পথ ধরে।

তাঁরা বাদশাহর কাছে গিয়ে বলে—শেখ আহমদ তার জন্য জীবন উৎসর্গে রাজি এমন হাজার হাজার মুরীদকে একত্রিত করেছে। এতে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। লোকটি ভীষণ অহংকারী ও উচ্চাভিলাশী। তাঁর উদ্দেশ্য যে মহৎ নয় এর বহু প্রমাণ আছে। বাদশাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে সিজদা জায়েয বলে স্বীকৃতি সে এর সম্পূর্ণ বিরোধী। পূর্বেও সে কোন দিন বাদশাহর মান মর্যাদা রক্ষা করে চলেনি। এখনও তাতে রাজি নয়। সম্রাট ইচ্ছে করলে এখনো তা পরীক্ষা করে দেখিতে পারেন। দেখবেন, সে দরবারে এসেও আপনাকে সিজদা করবে না।' জাহাঙ্গীরের জন্য

এই রাজনৈতিক বিপদাশংকা ধর্মীয় বিপদ থেকেও অধিকতর উদ্বেগ-জনক ছিল। এই শক্তির ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থান সম্ভাবনাকে সূচনাতেই নির্মূল না করলে তাঁর বাদশাহীর পতন অনিবার্য। জাহাঙ্গীর ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। মুজাদ্দিদ সাহেবকে পুনরায় শাহীদরবারে তলব করলেন। এরি মধ্যে কুচক্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের এক বিরাট ফিরিস্তিও তৈরী করে ফেলল তারা তাঁর বিকৃত পত্রগুলো আলেমদের ফতোয়া এবং মওলানা আবদুল হক মুজাদ্দিদ দেহলভী (রঃ)-এর নিবন্ধ-গুলো—বাদশাহর সামনে পেশ করল। উদ্দেশ্য, সম্রাটকে বিশ্বাস করানো, উৎসাহ দেয়া ও উত্তেজিত করা। মুজাদ্দিদ সাহেব দ্বিতীয়বার রাজ দরবারে হাযির হলেন। মোগল দরবারের প্রথা অনুযায়ী বাদশাহর প্রতি সম্মান দেখানোর দাবী করা হয়। আর এর অর্থ হলো সিজদা করা। কুচক্রী মহল ধারণা করেছিল,—এতে এক ঢিলে দু'পাখী মারা যাবে। মুজাদ্দিদ সাহেব যদি সিজদা না করেন তাহ'লে তিনি রাজ-দ্রোহী বলে ঘোষিত হবেন। আর যদি সিজদা করেই বসেন, তাহ'লে তাঁর উপর মুরীদ ও সাধারণ মুসলমানদের আর কোন আস্থাই থাকবে না।

কিন্তু যে শির একমাত্র আল্লাহ্‌র সামনে ভূলুন্ঠিত হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে—তা অন্য কোথাও অবনমিত হতে পারে না। তাই তিনি সম্রাটকে সিজদা দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন এবং দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী এই মুশরেকী সিজদা ও নানারূপ অনাচার ব্যভিচারে কুলষিত মোগল দরবারের সমগ্র অশুভ পরিবেশকে প্রকম্পিত করে দৃপ্ত কন্ঠে উন্নত মস্তকে বলে উঠলেন—"আস্‌সালামু আলাইকুম।" এই ইসলামী পন্থায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপনই মুজাদ্দিদ সাহেবের জন্য কাল হলো। "অতএব দরবারের সকল আলেম দরবারের আমীর উমরা-হদের সম্মান রক্ষার্থে সর্বসম্মতভাবে ফতোয়া দিলেন যে মুজাদ্দিদ সাহেব মৃত্যুদন্ডের সম্পূর্ণ উপযুক্ত,।

জাহাঙ্গীর মওলানা শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীকে খুবই ভক্তি করতেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেম বলে তাঁকে জানতেন। তাই এক্ষেত্রে মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রদত্ত তাঁর ফতোয়াই বেশী কার্যকর

হয়েছিল। সুতরাং সম্রাট মুজাদ্দিদ সাহেবের উপর খুবই ক্ষিপ্ত ও রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে দু'বছরের কারাদন্ড প্রদান করেন। তা ছাড়া তাঁর বাসস্থান ও সম্পদ বাজেয়াফত করারও নির্দেশ দেন। ফলে মুজাদ্দিদ সাহেব গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়। মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী কারারুদ্ধ হওয়ার পূর্বে বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে বলতেন,—

"মনে হয় আমার ঘোর বিপদ অত্যাসন্ন। তবে আমি ভীত নই। বরং সে বিপদ হবে আমার জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ—আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের স্তরে উন্নীত হওয়ার সোপান বিশেষ। অনুরূপ বিপদে না পড়লে ঐ স্তরে ওঠা যায় না। তাই যে কোন বিপদকেই আমি হাসিমুখে বরণ করে নেব।"

এসব বলার অল্প কয়দিন পরে সত্যি সত্যি তাঁর উপর এসে পড়ে সেই বিপদ—যে বিপদের আশংকা তিনি করছিলেন। এসে পড়ে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের স্তরে উন্নীত হওয়ার দিন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কারা-বরণের সুন্নত দিন। মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরুদ্ধে জারি হলো গ্রেফতারী পরোয়ানা।

"মর্দে মুজাহিদ বন্দী হলেন গোয়ালিয়ার দুর্গে। সেখানে সাথী পেলেন হাজার হাজার অনাচারী কয়েদীকে। এঁদের মধ্যে ছিল কয়েক হাজার পৌত্তলিক বে-ইমান ছিল। হাজার হাজার মুসলিম নাম-ধারী নাফরমান। চোর, গুণ্ডা, বদমাশ ও লুটেরার দল। রক্ত-পিপাসু নরহত্যাকারী, মদ্যপায়ী মাতাল ও চরম ব্যভিচারীর দল। এঁরাই ছিল তাঁর জেলখানার সাথী।

মানবতার মুক্তিদূত মুজাদ্দিদ সাহেব এঁদের ঘৃণা করলেন না। বরং তাঁদের এই পতনে তাঁর দরদী প্রাণ কেঁদে উঠলো। পাশে এসে দাঁড়ালেন তাদের। বন্দী-জীবনের একাকিত্ব, চরম দুঃখকষ্ট ও বিড়ম্বনাকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁদের পাশে এসে গেলেন। হাজির হলেন হেদায়েতের আলোক শিখা এবং মুক্তির পয়গাম নিয়ে। তাঁদের শোনালেন আশার বাণী, দেখালেন মুক্তির পথ, দিলেন সত্যের সন্ধান।

তাঁরা তাঁর কাছে শিখলো আসল ইসলামী শিক্ষা। নিল নৈতিক সংশোধন এবং চারিত্রিক মানোন্নয়নের দীক্ষা।

যাঁরা আওলিয়া তাঁরা হলেন পরশমণি। স্পর্শে লোহাও সোনায় পরিণত হয়; মুজাদ্দিদ সাহেবের সান্নিধ্যে আসে অমুসলিম কয়েদীরা। দলে দলে মুসলমান হয়ে যায় তাঁরা। মুসলিম কয়েদীদের জীবনে আসে পরিবর্তন, গ্লানিকর চরিত্রের হয় অবসান।

বন্দী-জীবনে মুজাদ্দিদ সাহেব কখনো বাদশাহকে অভিশাপ দেননি কিংবা তাঁর উপর রুষ্টও হননি। তিনি বলতেন, যদি বাদশাহ আমাকে কারাগারে না পাঠাতেন, তাহ'লে এই হাজার হাজার বন্দী ইসলামের মর্মবাণী কিভাবে উপলব্ধি করতো, কিভাবেই বা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতো। আর আল্লাহ্র নিকট আমার মর্যাদার এতটুকু সমুন্নতি,—এই মুসিবত ভোগের উপরই যা নির্ভরশীল ছিল—কি উপায়ে হাসিল হতো বস্তুত মুজাদ্দিদ সাহেব নবীদের কাজ করতে এসে কারাভোগের মাধ্যমে নবী—হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সুন্নাতকেই আদায় করছিলেন। কারণ, হযরত ইউসুফ (আঃ) ও মিশররাজ্যের কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও শা'বে আবুতালেব অন্তরীণ ছিলেন দীর্ঘ আড়াই বছর। মুজাদ্দিদ ও মর্দে মুজাদ্দিদদের ভাগ্যে এমনটি ঘটে থাকে।

কয়েকখানা পত্রেও জেহাদী প্রেরণা—

ইসলামী বিপ্লবের ধারা কোন বাধা মানে না। বাধা এলে তা থেমে যায় না। বরং তাঁর তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। বন্দী-জীবনের মানসিক পীড়ন ও দৈহিক নির্যাতন তাঁর বিপ্লবী চেতনায় বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি—বরং প্লাবন এনে দিয়েছে। কারার লৌহ-কপাটের অন্তরালে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থেকে স্নেহের পুত্র ও অন্যান্য ভক্তদের কাছে লেখা তাঁর পত্রই এর প্রমাণ। এসব পত্রে ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা অভাব অভিযোগের কোন কথা নেই। নেই মুক্তির জন্য কোনরূপ কাকুতি মিনতি। বরং আছে সেই একই বিপ্লবী দৃষ্টি-ভঙ্গী ও ভাবধারারই অভিব্যক্তি। আছে নিষ্ঠা একাগ্রতা, তম্ময়তা এবং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের উপদেশ বাণী।

আপন পুত্র খাজা মুহাম্মদ মাসুম সাহেবের কাছে মুজাদ্দিদ সাহেব জেলখানা থেকে লিখছেন,—

"প্রিয় পুত্র, কঠিন পরীক্ষার সময়টি দারুণ তিক্ত ও বিস্বাদে পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহর তৌফীক হলে তা হয় পরম অমূল্য ধন।

আজকাল খুবই অবকাশ আছে। সেজন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কর। এবং সদা আপন কর্তব্য কর্মে মশগুল থেকো। এই অবকাশের একটি মুহূর্তও নষ্ট হতে দিও না। কুরআন তেলাওয়াত, দীর্ঘ কেরাতের সহিত নামায আদায়, কালেমায়ে তাইয়েবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌— এসবকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসো এবং যেকোন একটির উপর আমল করো। 'লা'-ঘোষণা দ্বারা কু-প্রবৃত্তির সকল মিথ্যা মাবুদকে মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেল। প্রবৃত্তির এতটুকু কামনাও যেন বাকি না থাকে। (আল্লাহ্‌র রসুল সঃ-এর রাজি ও গররাজির দিকে নজর না রেখে) নিজের কোন মতলব হাসিলের চেষ্টা করা আর নিজে নিজে খোদাই দাবী করার মধ্যে বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নেই।

আল্লাহ্ নিরাপদে রাখুন!

আমার সাথে আর দেখা হোক বা না হোক, তোমাদের প্রতি আমার একমাত্র নসীহত এই যে, ব্যক্তিগত কোন মোহ যেন কখনো না থাকে। এজন্য কখনো উদ্‌গ্রীব হবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপরই সব সোপর্দ করে দাও। এমনকি আমার জেল থেকে মুক্তিও— যা আজকাল তোমাদের বিরাট উদ্দেশ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে তা-ও যেন তোমাদের বাসনা কামনার বস্তু না হয়। আল্লাহ্ তায়ালার তাক্‌দীর পূর্ণ হোক। তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হোক। এই হওয়া উচিত তোমাদের একমাত্র কাংক্ষিত লক্ষ্য।

জীবনের বাকি দিনগুলো এমন কষ্ট ও মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছে যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মৃত্যু দ্বার প্রান্তে হাজির। তাই তা আরো অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

ছোটদের স্নেহ করবে, পড়ালেখার উৎসাহ দেবে, আমার উপর যাদের কোন হক রয়েছে আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে যথাসাধ্য রাজি রাখতে। ঘর-বাড়ী, পুকুর বাগ বাগান ও গ্রন্থরাজির শোক অতি স্বাভা-

বিক ব্যাপার। আমি যদি মরতাম তবুও এসব হাত ছাড়া হতো। এখন জীবন থাকতেই হাত ছাড়া হয়েছে। এজন্যে কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ্‌র অলিগণ স্বয়ং এসব জিনিস বর্জন করে থাকেন। এখন শোকর কর আল্লাহ্ নিজেই আমার পার্থিব জিনিস থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যেখানে আছি কোন রূপে থাকছি। দুনিয়াতে যে ক'দিন আছ, জীবন ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহ্‌র স্মরণে কাটাও। আখেরাতই আসল বাড়ী, কাজেই আখেরাতের প্রতি লক্ষ্য রাখো। তোমার আম্মাকেও সান্ত্বনা দিও এবং আখেরাতের প্রতি যেন আগ্রহশীল হয় সেজন্য যত্নবান হও।

আল্লাহ্ তা'আলা যদি চান তাহ'লে অনায়াসেই আমাদের মধ্যে আবার মিলন ঘটবে। তা না হ'লে আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থেকো। দোয়া করো দারুস সালামে (জান্নাতে) যেন সবাই মিলিত হতে পারি এবং দুনিয়ার এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের প্রতিবিধান করতে পারি।"[১]

মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর মুরীদ ও সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সহকর্মী শেখ বদিউদ্দিন সাহেবের কাছে পত্র লিখছেন,—

"শেখ ফতহুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমে আপনার পত্রটি পেয়েছি। এতে জুলুম নির্যাতনের অভিযোগ করা হয়েছে। এসব জুলুম নির্যাতন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য সৌভাগ্য-সোপান এবং তাঁদের অন্তরের অহংকার দুরীকরণের জন্য শানদানকারী রেত-স্বরূপ।

সুতরাং এসব অত্যাচার নিপীড়ন দেখে মনকে সংকুচিত ও কলুষিত করার কি কারণ থাকতে পারে?

এই অধম কারাগারে আসার পরই দেখতে পেয়েছে যে, মানুষের এসব গাল-মন্দ ও উৎপীড়ন নূরে (আলোকে) রূপান্তরিত হচ্ছে [illegible] শহর ও পল্লীর উপর দিয়ে এসে মেঘের আকারে আমার উপর ব[illegible]ছে। এতে আমার মর্যাদা আরও বাড়ছে, কমছে না। নির্যাতন[illegible]বিঘ্ন শান্তি ও আরামের এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে বহু বছর কাটি[illegible] দার

১. পত্র নং ২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭

উচ্চশিখরে আরোহণ করতে পারিনি। এখন কঠোর নিপীড়ন ও সংঘাতসংকুল পরিস্থিতির মধ্যে সাধনা দ্বারা চূড়ায় পৌঁছার সোপান অতিক্রমের প্রয়াস পাচ্ছি। ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপরই কায়েম থাকুন।

"আপনি লিখেছেন যে, ফিত্না ফাসাদের কারণে এবাদত বন্দেগীতে না পূর্বের সেই মজা আছে, না সেই অবস্থা আছে।' কিন্তু কেন? এ সময়তো তৃপ্তি আরো বেশী লাগা এবং অবস্থার আরো উন্নতি হওয়াই উচিত ছিল। কেননা প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের চেয়ে বিরহ জ্বালায় তৃপ্তিই অধিক।"[১]

আন্দোলনের আর একজন সহকর্মী মীর মোহাম্মদ লোকমান সাহেবকে লিখেছেন,—

'জানা গেছে যে, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুমহল আমায় মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। যা হোক! আল্লাহ্ যা করেন, তাতেই কল্যাণ। তবে মানুষ হিসেবে প্রথমে কিছু কষ্ট অনুভব হয়েছিল, কিন্তু পর মুহূর্তেই তা দূর হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানীতে আমার মন-প্রাণ আনন্দ ও খুশীতে ভরে গিয়েছে। আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যাঁরা আমাদের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য আমাদের উপর চরম জুলুম করছে। তাঁদের ইচ্ছা যখন আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে মিলে গিয়েছে, তখন মনঃক্ষুন্ন বা দুঃখিত হওয়ার কোনই কারণ থাকতে পারে না। তা ভালবাসার দাবীর সম্পূর্ণ বিরোধী······প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদের কোন দান বা পুরস্কারে নিতান্ত আনন্দিত হয়,—ঠিক তেমনি তাঁর জুলুম-পীড়নেও পুলকিত হয়। বরং এতে মজা আরও বেশী। এই হচ্ছে খাঁটি প্রেমিকের সঠিক পরিচয়।

"আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। এই অধম বান্দাহকে কষ্ট দেয়া ও মুছিবতে ফেলা তাঁর মনঃপুত। এতে আমি আনন্দ এবং মজাই পাচ্ছি। এটা আল্লাহ্রই অশেষ মেহেরবানী আর যখন এই জালিমদের ইচ্ছা

১. পত্র নং ৬, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২-১৩

আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুরূপ—তখন নিঃসন্দেহে আমার দৃষ্টিতে তা পসন্দনীয় এবং আনন্দদায়ক, (বাহ্যতঃ আমাদের উপর যে জুলুম করেছে) সে কে? কি তার পরিচয়? এ-তো আমাদের প্রেমাস্পদেরই কার্যের প্রতিবিম্ব। তাই যারা আজ অত্যাচার করেছে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তাঁরাই আমার অধিক প্রিয়।

বন্ধুদের বলবেন, তাঁরা যেন তাঁদের মনের সংকীর্ণতা দূর করেন এবং অত্যাচারীদের অনিষ্টের কল্পনাও যেন না করেন বরং তাঁদের অত্যাচারে যেন তৃপ্তি পান।

তবে হাঁ, দোয়া করা সবার কর্তব্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি মিনতি করে দোয়া করুন এ বিপদ যেন তিনি উঠিয়ে নেন।

মনে রাখবেন প্রকৃত গজব আল্লাহ্‌র দুশমনদের উপরই পড়ে। আল্লাহ্ প্রেমিকদের উপর যে বিপদ আসে, দেখতে গজবের মত মনে হলেও আসলে তা আল্লাহ্‌র অশেষ করুনা, আল্লাহ্ প্রেমে যাঁরা মগ্ন, তাঁদের জন্য যে কত কল্যাণকর তা কল্পনারও বাইরে। তা-ছাড়া গজবের বাহ্যিক দিকটার মধ্যে অবিশ্বাসীদের জন্য অকল্যাণই নিহিত রয়েছে এবং তাঁদের পরীক্ষার জন্যেই তা করা হয়েছে।"[১]

দেখা যায় মুজাদ্দিদ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের গতি ছিল দুর্বার, শক্তি ছিল দুর্দম। তাঁকে কারারুদ্ধ করেও তা রোধ করা যায়নি। বরং লৌহ-প্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করায় আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কারা-প্রাচীরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থেকেও এই মর্দে মুজাহিদ ও যুগের মুজাদ্দিদ নিজে অবিরত, অপ্রতিহত সাধনাকে সু-নিয়ন্ত্রিত, সু-পরিচালিত ও সাফল্যমন্ডিত করার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বন্দী জীবনে তাঁর আল্লাহ্‌র প্রেম, নিষ্ঠা, ত্যাগ-তীতিক্ষা আরো বেড়ে গিয়েছে। ইসলামের স্বরূপ ও আদর্শকে আন্দোলনের সহ-কর্মীদের কাছে আরো অধিকতর সুন্দর, অধিকতর উজ্জ্বল এবং ব্যাপক-রূপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এই সংগ্রামের উদ্দেশ্যে স্বার্থপরতা আত্মম্ভরিতা বা ভাব-প্রবণতা ছিল না বরং এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল

---

১. পত্র নং ১৫, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮-১৯

একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান—প্রতিটি পত্রের ছত্রে ছত্রে রয়েছে এরই প্রমাণ, আরও কথা রয়েছে যে ইসলামী আন্দোলনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কন্টকাকীর্ণ। এবং এপথ অতিক্রম করতেই রয়েছে বিশ্বমানবতার সত্যিকার মুক্তি,—আর তিনি যে এ কঠোর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছেন, তারই প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছে পত্রগুলোর পাতায় পাতায়।

জিন্দানখানা থেকে নজরবন্দে

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁর অনুযায়ী দল এবং শাহী দরবারের প্রভাবশালী গোষ্ঠী মুজাদ্দিদ সাহেবের এই মহান ইসলামী আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিলেন। পরিণামে তাঁরাই ব্যর্থকাম হয়েছিল। অপরদিকে মুজাদ্দিদ সাহেবের সততা, নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ রাজনীতি এবং ধৈর্য স্থৈর্য তাঁকে পুর্বের চাইতে অধিক মজবুত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে দিয়েছিল। এজন্য তাঁরা কুটচাল চেলেছিল এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরুদ্ধে দেশী ও বিদেশী আলেমদের থেকে যত কাফের ও মর্দুদ হওয়ার ফতোয়া এনেছিল, সবই ব্যর্থ হয়ে গেল।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাগর্বীদের ন্যায় সে যুগে বন্দীদের চিঠিপত্র আদান-প্রদানে এবং সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎদানের উপর কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল না। তাই মুজাদ্দিদ সাহেব অনায়াসে সহকর্মীদের কাছে চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁদের সাক্ষাৎদান করতেন এবং নানারূপ উপদেশও দিতেন। এছাড়া কারাগারের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে তিনি অবাধে মেলা মেশা করতেন। তাঁদের সামনে ইসলামের সত্য সুন্দর রূপটি তুলে ধরতেন এবং তাঁদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান জানাতেন। দুর্গের অধিকর্তা এসব পর্যবেক্ষণ করতেন এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের চাল-চলন, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টি-ভঙ্গি ও ভাব-ধারা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বাদশাহকে সবসময় রিপোর্ট দিতেন। জাহাঙ্গীর দেখলেন, যার বিরুদ্ধে তিনি ধোকা প্রবঞ্চনা, দাম্ভিকতা ও আত্মসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতার অভিযোগ এনেছিলেন, যাঁকে কাফের, ধর্মহীন, অহংকারী ও ক্ষমতালোভী ভেবেছিলেন,—তাঁর চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি হলেন সততা, পবিত্রতা, নৈতিকতা ও সচ্চরিত্রতা এবং ইসলামী আদর্শের বাস্তবরূপ ও মূর্ত প্রতীক। তাঁর বলিষ্ঠ ঈমান ও নির্মল চরিত্র কারাগারের হাজার হাজার বংশগত চির অভ্যস্ত ডাকাত, চোর, গুন্ডা ও বদমাশকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছে, করেছে আকর্ষণ; হয়ে গেছে তাঁরা সততা ও হেদায়েতের রঙে রঙীন।

যাঁদের সারা জীবন জুলুম নির্যাতন, ডাকাতী লুন্ঠন, মানুষের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি এবং শান্তিভঙ্গের কাজে ব্যয় হয়েছে-কারাগারের কঠোর শাস্তি এবং অমানুষিক নির্যাতনও যাঁদের শায়েস্তা করতে পারেনি, পারেনি তাঁদেরকে সৎজীবন যাপনে বাধ্য করতে সেসব কাফের বিধর্মী ও পাষণ্ডই শুধু বছর খানিক মুজাদ্দিদ সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। সৎজীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, নিষ্ঠা, সততা ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। এই সবের অনিবার্য পরিনাম হইল এইযে,

"দু' বছর পর সম্রাট স্বীয় কৃতকর্মে খুবই লজ্জিত হন, এবং হযরত শেখকে নিজের কাছে ডেকে এনে অধিকতর মান মর্যাদা দান করেন। তাঁর প্রতি অনেক বিনয়ীভাব দেখান। হযরত শেখের প্রতি বাদশাহ এতই অনুরক্ত হয়ে পড়েন যে, ক্ষণিকের জন্যও তাঁর সান্নিধ্য ছাড়তে রাজী ছিলেন না। তিনি শাহজাদা খুররম (শাহজাহান)-কে হযরত শেখের মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত করিতে দেন। সুতরাং শাহজাহান ও আলমগীরের শাসনকাল পর্যন্ত বাদশাহ এবং সকল আলেম ও মন্ত্রীগণ "মুজাদ্দেদিয়া তরিকায়' মুরীদ হতেন।"[১]

সম্রাটের নির্দেশে মুজাদ্দিদ সাহেব কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন এবং মহামান্য অতিথির বেশে শাহী দরবারে আগমন করলেন। তিনি দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করলেন, কিন্তু ক্ষণিকের তরেও নীতি বিচ্যুত হননি। তিনি মুক্তি পেলেন বটে; কিন্তু সত্যিই কি তা মুক্তি ছিল? ছিল না। জেল থেকে খালাস পেলেও মর্দে মুজাহিদরা সবকিছু থেকে নাজাত পান না। চক্রান্তকারীরা এখানেও আর একটি কূটনৈতিক চাল চেলেছে।

শাহজাহান মুজাদ্দিদ সাহেবের ভক্ত অনুরাগী ছিলেন। এইজন্য মুজাদ্দিদ সাহেবের দল শাহজাহানের পক্ষ নেবে এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া শাহজাহানের বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা এবং রাষ্ট্রের বড় বড় খেদমত একদিকে তাঁকে জাহাঙ্গীরের নিকট ঘনিষ্ঠতর ও প্রিয়তর করে তুলেছে—অপরদিকে এটাই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্রাজ্ঞী

১. খাজিনাতুল আছফিয়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৩

নূরজাহান এসব কারণে শাহজাহানের অস্তিত্বকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে স্থায়ী আশংকার বস্তু মনে করতে লাগলেন।

নূরজাহান জামাতাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করানোর উদ্দেশ্যে নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। এজন্য তিনি কূটনৈতিক চালের আশ্রয় নিলেন। তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবকে কোন প্রকারের স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে তাঁর দলকে পরাজিত ও নির্মূল করার ষড়যন্ত্র পাকালেন। শাহজাহানের প্রতি সম্রাটকে বীতশ্রদ্ধ করে তুললেন। বাধ্য হয়ে শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শাহজাহান পিতার স্নেহলাভে বঞ্চিত থাকলেন।

নূরজাহানের কূটনৈতিক চাল মুজাদ্দিদ সাহেবের ব্যাপারেও কাজ করেছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুজাদ্দিদ সাহেবকে শাহী দরবারে ও পরে সৈন্য ছাউনীতে নজরবন্দী হিসেবে থাকতে হয়েছে। এটা কি সম্রাটের ভক্তি ও অনুরক্তি ছিল? না কি কূটনৈতিক চাল ও রাজনীতি? প্রকৃতপক্ষে এখানেও নূরজাহানের রাজনীতির বিশেষ দখল ছিল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, মুজাদ্দিদ সাহেবকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিলে এবং স্বাধীনভাবে যত্রতত্র চলাফেরার অধিকার দান করলে শাহজাহানের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ফলে তার উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। তাই অনুরক্তি ও ভক্তির আতিশয্য দেখিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাঁকে রাজধানীতে নজরবন্দীই করে রাখা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন যাবৎ গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়া হয়নি।

বাদশাহর প্রতি উপদেশ

মুজাদ্দিদ সাহেব এই নজরবন্দী অবস্থাতেও স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে যান নি। বাদশাহ, শাহীদরবারের সকল উজীর-নাজীর এবং ছাউনীর সৈন্যদের মধ্যে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে লাগলেন। বুঝাতে লাগলেন ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী বিধি-বিধানের তাৎপর্য কি! এ সম্পর্কে আপন পুত্রের কাছে পত্র লিখছেন,—

"এখানের অবস্থা সন্তোষজনক ও প্রশংসনীয়। অত্যাশ্চর্য লোকদের সাথে মেলামিশার সুযোগ আছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্! এই মেলামিশার সময় দ্বীনি বিষয়াবলী ও ইসলামী বিধি-বিধান নিয়ে বাদশাহর সাথে

যে আলোচনা হচ্ছে, তাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা আত্ম-প্রতারণা এবং রূঢ় ভাষার স্থান নেই। একাকী ও বিশেষ বৈঠকে যেসব শব্দ, যেসব কথা এবং যেসব ভাষা প্রয়োগ করা হয়, এসব আলোচনা ও তর্কযুদ্ধে ও ঠিক যেসব শব্দ, কথা ও ভাষাই আল্লাহ্‌র ফজলে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক বৈঠকের বর্ণনা যদি দিতে যাই তাহ'লে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

আজ ১৭ই রমজান। এই দিন রাত্রেও একটি আলোচনা বৈঠক হয়েছে। এতে নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য, ইসলামের সকল দিকও মাসায়েল, শরীয়ত বোধগম্য হওয়ার জন্য আকল ও বুদ্ধি যে একমাত্র নির্ভুল ও যথেষ্ট নয় তাঁর যৌক্তিকতা আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের উপর ইমান আনা, আল্লাহ্‌র দাদীর, নবুয়তের সমাপ্তি, প্রত্যেক শতাব্দীর মুজাদ্দিদ খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ, তারাবীহ্ নামাযের সুন্নাত হওয়া, জন্মান্তর বাদের বাতিল হওয়া এবং জিন-পরী ও তাদের শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সবাই খুব ধৈর্য সহকারে এসব শুনেছেন। 'কুতুব' ওলী আবদাল এবং তাঁদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও কথা উঠেছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্! আমার বিশ্বাস, যথাস্থানেই এসব বর্ণিত হচ্ছে।"[১]

মুজাদ্দিদ সাহেব এই সময় পুত্রগণকেও রাজধানীতে তাঁর কাছে ডেকে এনেছিলেন। কিছুদিন তাঁরাও পিতার সান্নিধ্যে ছিলেন। এরপর পুনরায় তাঁরা গৃহে ফিরে যান। কিন্তু মুজাদ্দিদ সাহেবের বাড়ী যাওয়া ভাগ্যে ঘটে নি। তিনি নজরবন্দী। সেনানিবাসেই থেকে যেতে বাধ্য হন। নজরবন্দী অবস্থায় লিখছেন,—

"স্নেহের পুত্রগণ সবসময় আমার সাথেই থাকতে চায়। এজন্য তাঁরা যে পরিমাণ ব্যাকুল—ঠিক সে পরিমাণ আকুল আমিও। কিন্তু সকল আশা কখনো পূর্ণ হয় না। এর কি কোন প্রতিবিধান আছে? আমি ক্ষমতাহীন। অধিকার থেকেও বঞ্চিত। তবে এ অবস্থায়ও সৈন্যদের মাঝে থাকা নেহায়েত মূল্যবান বলে মনে করি। এখানে এমন জিনিস আছে, অন্যত্র যা পাওয়া যায় না। এখানকার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, পরিস্থিতি ও অব-

---

১. পত্র নং ৪৩, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৬

স্থান ভিন্ন রকম। বাদশাহর পক্ষ থেকে আমার উপর যে বাধা আরোপিত, আমি তাঁকে আল্লাহ্র অপার মহিমা ও পরম সন্তুষ্টির পুরস্কারই মনে করি। এবং এই বন্দী-জীবনের মধ্যেই আমার চরম সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করি। বিশেষত এই ফিত্‌নার যুগে অদ্ভুত ধরনের কার্যকলাপ চলছে। স্নেহের পুত্রগণ দারুণ অন্তর্জ্বালায় জর্জরিত এবং এই বিচ্ছেদের আগুনে দগ্ধিভূত। কিন্তু আমি জানি, আমার ব্যাকুলতা তাঁদের আকুলতার চাইতে অধিক। যদিও সাধারণ যুক্তি এই যে, ছেলে-মেয়ের ভালবাসাই বাবা-মা'র চেয়ে বেশী হওয়া উচিত। কেননা, সন্তান-সন্ততি হলো শাখা-প্রশাখা। আর শাখা-প্রশাখারই টান, আকর্ষণ ও মুখাপেক্ষিতা মূলের প্রতি অধিক হয়ে থাকে। কিন্তু সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, পিতার ভালবাসাই সন্তানের প্রতি অধিক। পূর্বপুরুষ থেকে এটাই চলে আসছে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই বলে।"[২]

পুত্রদের কাছে লিখিত অপর এক পত্রে মুজাদ্দিদ সাহেব বলেছেন,—

"সাধারণতঃ আমার গ্রেফতারী সকলের কাছে আশঙ্কা ও ভয়ের বস্তু। এজন্য আমার মুক্তির চেষ্টা চলছে। কিন্তু সবাইকে এটা কে বোঝাবে যে, এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে চরম ব্যর্থতা বরণ করা ও এই চেষ্টায় অক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার মধ্যে কোন সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে? আল্লাহ্‌ আমাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। সকল দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছেন এবং আমার স্বেচ্ছাধীন বিষয়গুলোকেও আমার এখতিয়ারমুক্ত করে আপন ইচ্ছাধীন ও এখতিয়ার-ভুক্ত করে নিয়েছেন। এভাবে আমাকে এমনই বে-এখতিয়ার করে দিয়েছেন—"গোসলদানকারীর হাতে মুর্দা যেমন বে-এখতিয়ার হন। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমার জন্য আর কি হ'তে পারে?

"গ্রেফতার কালে যখন নিজের অক্ষমতা ও ইসলামী আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রতি তাকাতাম, তখন খুবই ব্যথিত হতাম। কিন্তু সাথে সাথে এক অদ্ভুত ধরনের স্বস্তি আর আস্বাদও পেতাম। যারা অনুরূপ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত এবং এর সাথে অপরিচিত তাঁরা এর মর্ম কি বুঝবে? ছেলেরা মনে করে যে, মজা ও স্বাদ শুধু শিরনীর মধ্যেই

২. পত্র নং ৭৮ ২য় খন্ড পৃঃ ১৩০

নিহিত। কিন্তু যখনই টকের মজা পায়, তখন শিরণী তাঁদের কাছে বিস্বাদ হয়ে দাঁড়ায়।"[১]

কিছুদিন পর মুজাদ্দিদ সাহেবকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়া হয়! দীর্ঘদিন পর কারামুক্ত হয়ে এই সংগ্রামী বীরপুরুষ, যুগ-নায়ক, মর্দে মুজাহিদ সারাহিন্দে স্বগৃহে ফিরে আসেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সাথে আবার মিলিত হন। সন্তানেরা ফিরে পায় তাঁদের আব্বাকে। বিবি সাহেবা পান বাঞ্ছিত ধন। অনুসারীরা পান তাঁদের বিপ্লবী নায়ক, মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রঃ)-কে। আনন্দে মুখরিত হয় গৃহাঙ্গন। সবাই জানায় তাঁকে সাদর সম্ভাষণ।

---

৩. পত্র নং ৮৩, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৪২

আন্দোলনের সফলতা

মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রঃ) মানুষের ব্যক্তিগত সমষ্টিগত, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় চরিত্রের সংশোধনের জন্য যে সংস্কার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন,— জেল-জুলুম ও চরম নির্যাতন ভোগ করেন—তা যে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল, তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে যুগের বিচারে। তা বিচার করা যাক।

জাহাঙ্গীরের আত্মসমর্পণ

মুজাদ্দিদ সাহেবের বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ এই ছিল যে, তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে স্বীয় চারিত্রিক মাধুর্যে বশীভূত করতে পেরেছিলেন। সম্রাট বিশেষ বিশেষ বৈঠকেও মুজাদ্দিদ সাহেবের বক্তব্য খুব ধৈর্যের সাথে শুনতেন। এরপর জাহাঙ্গীর যদিও বিশেষ রাজনৈতিক কারণে মুজাদ্দিদ সাহেবকে সৈন্যদের ছাউনীতে নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু এটাই পরে মুজাদ্দিদ সাহেবের আন্দোলনের পক্ষে 'সোনায় সোহাগা' হয়েছিল। তিনি সেনাবাহিনীর সাথে অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ পান। তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন এবং তাঁদের মধ্যে শরীয়তের প্রাণ উজ্জীবিত করেন। এই সেন্যবাহিনীই সেই বছর 'কাংড়া' দুর্গ জয় করে। অথচ হাজার বছর ব্যাপী আপ্রাণ প্রচেষ্টার পরও পূর্ববর্তী কোন মুসলমান বাদশাহ তা জয় করতে পারেন নি। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর এবং অনেক কুশলী বীর সৈনিকদের মতে —"এই দুর্গ জয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

কিন্তু এই অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে? অস্ত্রবল, জনবল, সৈন্যবল তো বাদশাহদের ছিল। তবে কেন এতদিন তা সম্ভব হল না? আসলে মুসলমানদের জয় অস্ত্র বলে নয়। নয় শুধু সৈন্য বলেও; বরং তাদের জয় নির্ভরশীল ঈমানের উপর ঈমানী শক্তির উপর। এই ঈমামী শক্তি পয়দার কাজই মুজাদ্দিদ সাহেব সেনাবাহিনীর মধ্যে করেছেন। আর এই বিজয়ী সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন, সৈয়দ ফরিদ। মুজাদ্দিদ সাহেবের বিশিষ্ট মুরীদ ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের সহায়। অসম্ভব বলে কোন কথাই নেই। বিজয় আমাদেরই হবেই ইন্‌শায়াল্লাহ্। এই ঈমানী শক্তিতে উজ্জীবিত মুসলিম বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো ময়দানে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে রব উঠলো আল্লাহু আকবর। দ্রুত নেমে এলো আল্লাহ্ সাহায্য। বেজে উঠলো মুসলমানদের বিজয় ডঙ্কা। মিটল হাজার বছরের স্বপ্ন সাধ। দখলে এলো কাংড়া দুর্গ।

দুর্গ বিজয়ের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর কাজী ও অন্যান্য আলেমগণকে সাথে নিয়ে নিজেই কাংড়া দুর্গ পরিদর্শনে যান। সেখানে আজান, নামাজ, খোত্‌বা, প্রভৃতি ইসলামী বিধিগুলো চালু করান। মসজিদ বানান। এই সু-ব্যবস্থা করতে পারায় বাদশাহ খুবই আনন্দিত হন।

গরীবখানায় বাদশাহ

সম্রাট জাহাঙ্গীর মুজাদ্দিদ সাহেবকে জেলে পুরেছিলেন, নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মুজাদ্দিদ সাহেবের সত্য ও ন্যায়ে অটল মনোভাব দেখে তাঁর ভক্তও হয়েছিলেন। তাই কাশ্মীর যাতায়াতের পথে দু'বার মুজাদ্দিদ সাহেবের সারহিন্দের বাড়ীতে আতিথ্যও গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমবার একদিন ও পরের বার দু'দিন সেখানে ছিলেন। এসময় খাওয়া-দাওয়াও সেখানেই করেন। এটা মুজাদ্দিদ সাহেবের প্রতি জাহাঙ্গীরের অশেষ অনুরক্তি এবং ভক্তের মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক।

শেষ জীবনে জাহাঙ্গীর প্রায়ই বলতেন,—

"আখেরাতে নাজাতের আশা করতে পারি এমন কোন কাজ আমি করিনি। তবে আমার কাছে একটা দস্তাবিজ আছে। সেসময় তা আল্লাহ্‌র সমীপে আমি পেশ করবো। সেই দস্তাবিজ হলো এই যে, একদিন শেখ আহমদ সারহিন্দী আমাকে বলেছিলেন—"যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেন—তা হ'লে তোমাকে ছেড়ে যাব না।"[১]

যদি মুজাদ্দিদ সাহেব অনুরূপ কিছু সত্যিই বলে থাকেন—তবে জাহাঙ্গীরের সৌভাগ্যই বলতে হবে।

---

১. ওলামায়ে হিন্দ-কা-শান্‌দার মাজি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২

বৈপ্লবিক বিবর্তন

মুজাদ্দিদ সাহেবের সাধনা ও সংগ্রামের প্রকৃত ও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বাদশাহ্ শাহজাহানের শাসননীতির আমূল পরিবর্তনে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবন-সংগ্রামে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুজাদ্দিদে দেহলভী (রঃ) ও তাঁর বংশধরগণের শতাব্দীব্যাপী সাধনায় এবং মুসলিম ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সর্বপ্রথম ও প্রধান নায়ক সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রঃ)-এর জিহাদ ঘোষণায়।

শাহজাহান ও আলমগীর পূর্ণ দ্বীনদারীর সাথে প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত বাদশাহী করেছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব যে পরিবেশ ও ভাবধারার সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন,—তার কারণেই সম্রাট দ্বয়ের পক্ষে অনুরূপ সততা, যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে রাজ্যশাসন সম্ভব হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের পরবর্তী বংশধরগণ যদি যোগ্য, সাহসী ও প্রজ্ঞাবান হতেন, —তাহ'লে সেই পরিবেশ ও ভাবধারা আজো সঞ্জীবিত থাকতো।

সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের ধর্মদ্রোহিতা এবং ইসলামের প্রতি তাদের বৈরিতার মূল কারণ,---শাহীদরবারের সভাসদগণের ধর্মহীনতা ও স্বার্থপর আলেমগণের, আত্মসর্বস্বতা। এই মানবরূপী শয়তানদেরকে দরবার ও সরকার থেকে বহিষ্কৃত করলেন কে? কার বিপ্লবী ভাবধারা ও সংগ্রামী কর্মধারা, কার জিহাদী চেতনা ও ঈমানী প্রেরণা এই অসাধ্য সাধনে সক্ষম হলো? এর সঠিক উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সত্যিকার সফলতার কথা।

৪. আকবর ভূভারতে শান্তি, শৃংখলা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি দ্বীনে এলাহীর বিলুপ্তি ও শান্তি, সৌহার্দ ও প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে তথাকথিক ধর্মীয় উদারতা ও সহনশীলতার দুখ আবরণে 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামে এক অভিনব ধর্ম প্রবর্তনের উদ্ভট পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সৌভাগ্যবশত সমসাময়িক কালের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী আবুল ফজল, ফৈজী, বীরবল, রাজা টোডরমল্ল, মোল্লা মোবারক প্রভৃতি নবরত্নকে আকবর তাঁর সহায়ক হিসেবে পেয়ে গেলেন। দুনিয়ার সর্বপ্রকার ধন-সম্পদ তাঁর রাজ-কোষাগারে সঞ্চিত হলো। সৌভাগ্য সূর্য তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করলো। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রতাপের ছাপ সকলের

অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে বসে গেল। আপন দ্বীন-ধর্ম ছেড়ে সব ধর্মের জ্ঞানী-গুণী, পীর-পুরোহিত বাদশাহকে দর্শনের সময় ভূমির উপর উপুড় হয়ে পড়ে সিজদা দিতো এবং এজন্য নিজেকে বড়ই কৃতার্থ মনে করতো। চারদিকে আকবরেরই জয়-জয়কার। প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর এমনই ছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীণ আওয়াজ তোলার সাহসও কারো ছিল না। এ প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাট প্রবর্তিত, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো যে, আজ সারা দুনিয়ায় এর একজন অনুসরণকারী তো খুঁজে পাওয়া যাবেই না,—তদুপরি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের পরও এ সম্বন্ধে কিছুটা অস্পষ্ট ধারণা লাভ ছাড়া আর কিছুরই সাক্ষাৎ মিলবে না। এটা কিসে সম্ভব হলো?

এ জিজ্ঞাসার জওয়াবই মুজাদ্দিদ সাহেবের সংগ্রাম ও সাধনার বিজয়বার্তা বহন করে।

আকবর ঘোষণা করলেন,—হিজরী সনের এক হাজার বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং ইসলাম ধর্মেরও সমাপ্তি ঘটেছে। এখন থেকে তাঁর যুগ, তাঁর দ্বীন-ই-ইলাহীর যুগ শুরু হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় বান্দা সায়েক আহমদ সারহিন্দী (রঃ) প্রমাণ করে দিলেন যে, শেষ নবীর প্রচারিত ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। কিয়ামত পর্যন্ত এটা সকল যুগের, সব দেশের, সমস্ত মানুষের জন্য সমানভাবে উপযোগী ও কার্যকরী হয়ে থাকবে। কারণ, ইসলাম আল্লাহ্‌র দেয়া পূর্ণাংগ ও শাশ্বত জীবন-ব্যবস্থা। যে এটাকে ধ্বংস ও নির্মূল করতে চাইবে, সে নিজেই সর্বস্বান্ত ও বিনাশ হয়ে যাবে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতার কারণে মুসলমানদের হুকুমত খতম হয়ে যায় সত্য। কিন্তু মুজাদ্দিদ সাহেব ভাবে ও কর্মে যে ধর্মীয় প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, তাঁর বিলুপ্তি ঘটেনি। বরং এই ভাবধারা ও কর্মধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। আর তা পূর্ণতা লাভ করে মুসলিম ভারতের পরিণামদর্শী আলেম ও প্রধানতম চিন্তানায়ক শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভীর (রঃ) অবিরাম সাধনা, সুক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী আলেম শাহ আব্দুল আজিজ

(রঃ)-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সুপরিকল্পনা এবং মুসলিম ভারতের ঘোর দুদিনের সিংহপুরুষ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা ও শাহাদাতের মধ্য দিয়ে। তাঁদের সৃষ্ট এই জাতীয় অনুভূতিরই পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে মুসলিম জাগরণে ও তাঁদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়। এ আন্দোলন চিরন্তন, চিরপ্রাণবন্ত। কখনও তা নিষ্প্রাণ ও নিস্তেজ হয় না। তাই আজ আবার শোনা যাচ্ছে—

সে নিবিড় আচ্ছন্ন তিমিরে
বুক চিরে, কোন ক্লান্ত কণ্ঠ ঘিরে
দূর বনে উঠে শুধু
তৃষাদীর্ণ ডাহুকের ডাক।

সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে পূর্ব গগনে আভাসিত নবারুণের ঊষালোক।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়

বিপর্যয় যখন শুরু হয়, সবদিকেই শুরু হয়। মুসলিম ভারতে সুফী-বাদ এক অভিনব রূপ নেয়। গ্রীক, বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনের খপ্পরে পড়ে ইসলামী অধ্যাত্মবাদ আপন রূপ হারায়। পরিণত হয় বৈরাগ্যবাদে। পথিক হারায় তাঁর পথ। গতি হারায় তাঁর লক্ষ্য। হয়ে যায় স্তব্ধ। মহাবিপ্লবীরা রূপান্তরিত হয় মহাধ্যানীতে। ভুলে যায় ইসলামের বিপ্লবী চেহারা, মহানবী ও তাঁর আদর্শ অনুসরণের পরিবর্তে শুরু হয় পীরের পায়রবী। আল্লাহ্‌র খলীফারা হন পীরের খলীফা। পীরদের কোন কোন ক্ষেত্রে দেয়া হয় বিশ্বনবী ও সাহাবীদের ঊর্ধ্বেকার মর্যাদা। আলাদা হয়ে যায় শরীয়ত থেকে তরীকত।

ইসলামী আদর্শ ও অধ্যাত্মবাদের এই ঘোর দুর্দিনে মুক্তি সংস্কারের পতাকা বয়ে আনলেন মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী-(রঃ)। তিনি আঘাত হানলেন ইসলাম বিরোধী এই তাসাউফের উপর। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন,—

"শরীয়তের অধীনে না হ'লে যে কোন তরীকতই সু-স্পষ্ট গোমরাহী।"

"শরীয়ত এমন একটি জিনিস যে, যদি হযরত মুসা (আঃ) ও হজরত ঈসা (আঃ)-ও নবী না হয়ে আমাদের নবীর পরে আসতেন, তাহ'লে তাঁরাও আমাদের নবীর শরীয়ত মানতে বাধ্য হতেন।

"তরীকত পন্থী অনেক সময় তাঁর আধ্যাত্মিকতার পথে চলতে গিয়ে বিকারগ্রস্ত হয়।। মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' অনুরূপ বিকারেরই সু-স্পষ্ট লক্ষণ।"

মুজাদ্দিদ সাহেব এভাবে কুরআন ও সুন্নার মাপ কাঠিতে সুফীবাদের সংস্কার সাধন করেন। ইসলামী অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কে সৃষ্টি সকল অজ্ঞতা ও গোমরাহীর অপনোদন করেন। শরীয়তের মানদণ্ডে তরীকতের বিচার করেন এবং সত্যিকার ইসলামী সুফীবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। কেটে যায় মহানিশা ও সামনের কুয়াশা। তাসাউফে ফিরে আসে তার জিহাদীরূপ।

ব্যর্থ হ'লো 'হিন্দু মুসলিম একজাত' আন্দোলন

রাজ্য হারিয়েছে ভারতীয় হিন্দুরা। কিন্তু হারায়নি কুটিল বুদ্ধি। ছাড়েনি চক্রান্ত ও সাধনা। যে দেহে শক্, হুন্ হলো লীন্ সে দেহে মোগল পাঠানকেও হতে হবে বিলীন। তবে, তাঁরা দেখলো যুদ্ধ করে এই দুর্জয় শক্তিকে ঘায়েল করা দুঃসাধ্য। তাই ধারণ করলো বাঁকা পথ। চালালো চানক্যের কুটিল চাল। আঘাত হানলো মুসলমানদের দুর্বল দিকটির উপর। তা হলো নব-দীক্ষিত ও অজ্ঞ মুসলমানদের ভ্রান্ত করার তীব্র প্রয়াস। পশ্চিম থেকে আগত আউলিয়া বুজর্গ, জ্ঞানী-গুনী মুসলিম মনীষীগণের দ্বারাই ভারতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়। কিন্তু সারা ভারত ব্যাপী ইসলামী-শিক্ষা চালু তাদের সাধ্যাতীত ছিল। একাজ ছিল মুসলমান রাজা-বাদশাহ কিংবা শাসকদের। কিন্তু তাঁরা তো এসেছেন বাদশাহী করতে। তাই করেছেন। শুধু করেননি নব-দীক্ষিত এই মুসলমান ভাইবোনদের ইসলামী শিক্ষার সু-ব্যবস্থা। ফলে দিন দিন মুসলমান বেড়েছে। কিন্তু মুসলমানী সম্পর্কে রয়ে গেছে তাঁদের চরম অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি। এই অজ্ঞতা ভ্রান্তিই ছিল সেই দুর্বল দিকটি, যার উপর আঘাত হেনেছে ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধি। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গড়ে তুললো এক অভিনব আন্দোলন। যার মূল কথা হলো-"রাম-রহিম এক।' হিন্দুদের রাম যা—মুসলমানদের রহিমও তা-ই। মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়েও শুধুমাত্র ভক্তির মারফতেই তাকে লাভ করতে পারে। নামায-রোযা, পুজা-পার্বণ, হজ-জাকাত বা তীর্থ যাত্রার কোনই দরকার করে না।" পশ্চিমে নানক কবীর রামানন্দের ভক্তি আন্দোলন, পূর্বে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্মের মহাপ্লাবন—সব কিছুরই গোড়ার কথা 'হিন্দু-মুসলিমের একজাত করণ। ডঃ দ্বীনেশ চন্দ্র সেনের কথায়-"মুসলমানগণ ইরান-তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ বাঙালী হইয়া পড়িলেন।"[১]

---

১. বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য

যেগুণে আকবর ভারত ইতিহাসের কন্ঠহার হইয়া আছেন সেই গুণে হোসেন শাহ বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন।"[২]

সেই গুণটি কি এবং কোন পথে আকবর অর্জন করেছিলেন? মওলানা আকরম খাঁ তাঁর বর্ণনা দিচ্ছেন, "মুসলিম জনসাধারণ, বিশেষ করে তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এরূপ এক কলুষিত ইসলামবিরোধী আব-হাওয়ার মধ্যে অবস্থান করিতেছিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে ধর্মান্তরিত এই সমস্ত নও-মুসলমানদের পক্ষে-ইসলামের-সত্যকার শিক্ষা ও আদর্শের সহিত পরিচিত হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। সুতরাং কোন সময়ে সরাসরিভাবে এবং কোন সময়ে আরবী ফারসী নামের আবরণে তাঁরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেব-দেবীর এবং কু-সংস্কার সমুহকেই তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পায় এবং এই সমস্তই পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।"[৩]

এই অবস্থা চললো সারা মুসলিম ভারতে। আসলো সম্রাট আকবরের যুগ। "অসম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর না হ'লেও আকবর অবশ্যই শিক্ষিত ছিলেন না। সু-শিক্ষার মতই সৎ-সংসর্গের কল্যাণেও তিনি বঞ্চিত ছিলন। সেই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সহস্র বছর যাবৎ যে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ইসলাম ও মুসলমানদের সমাজ-জীবনের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল, সম্রাট আকবরের নিকট তাহা সমর্থন ও উৎসাহ পাইল। তিনি এই সমস্ত বিরুদ্ধবাদের ব্যাখ্যা তাদের প্রচুর সম্মান ও সমাদরের সহিত তাঁর দরবারে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। মুসলমানদের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল সম্পদ ও শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়ার জন্য যে ভারতে যে হিন্দু মানষিকতা নীরবে অথচ অব্যাহতভবে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছিল—ইতিহাসের লিখিত ও সর্বসম্মত রায় অনুসারে—সেই মানসিকতাকে জীবন-ধারায় প্রাধান্য দেয়ার জন্য কোনরূপ চেষ্টারই তিনি ত্রুটি করেননি। বলা বাহুল্য, একদিকে মুসলমান চিন্তানায়কগণ যে তীব্র ভাষায় আকবরের শাসননীতির নিন্দা করেছেন

২. ঐ

৩. মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৮১

এবং অপরদিকে মোসলেম বিরোধী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকগণ যে তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মহান সম্রাটরূপে প্রশংসাবাদ দিয়েছেন ইহাই তাঁর যথার্থ কারণ।''[৪]

একই কারণে হিন্দুরা আকবরকে আল্লাহ্র আসনে বসালো। ''দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো'' বলে অভিনন্দন জানালো। গর্বিত ও উচ্চধর্ম সচেতন হিন্দু রাজপুত সামন্তগণ শাহী হেরেমে তাঁদের সুন্দরী বোন ও রূপসী কন্যাদের পাঠিয়ে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত রইল। এসব অসাধু কার্যকলাপ ও চাটুকারিতা দ্বারা হিন্দুরা আকবরের বিভ্রান্ত করলো। ঠিক এই সময় ''রাম-রহিম এক''—তথা ''হিন্দু-মুসলিম এক জাত'' আন্দোলন হাজারগুণ তীব্রতর হয়ে উঠলো।

কিন্তু 'যেখানে ফিরাউন—সেখানেই আছেন মুসা (আঃ)।' মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী এগিয়ে এলেন ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে বাঁচানোর জন্য। ঘোষণা করলেন তাওহীদের মর্মবাণী। তীব্র আঘাত হানলেন 'রাম-রহিম' এক আন্দোলনের উপর বলছেন,—

''হিন্দুর ভগবান, রাম ও কৃষ্ণ আমার রহিম (আল্লাহ্র)-এর সামান্যতম সৃষ্টি। পিতা-মাতার মাধ্যমেই তাদের জন্ম হয়েছে। যে রাম নিজের স্ত্রীকেও রক্ষা করতে পারল না, সে কেমন করে অন্য মানুষকে রক্ষা করবে? বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আল্লাহ্কে রাম বা কৃষ্ণের নামে স্মরণ করা রীতিমত লজ্জা ও ঘৃণার ব্যাপার। ব্যাপারটি যেন এক মহা পরাক্রমশালী শাহানশাহকে তুচ্ছ ঝাড়ুদার নামে স্মরণ করা। রাম ও রহিমকে এক মনে করা চরম নির্বুদ্ধিতা বই কিছুই নয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টি—খালেক ও মাখলুক কখনো এক হতে পারে না। সসীম ও অসীম কোন দিনই সমান হতে পারে না।''

এভাবে বিলুপ্তি ঘটলো এক হীন উদ্দেশ্যের—হিন্দু ও মুসলিমদের এক জাতি বানানোর ষড়যন্ত্রের। এই অশুভ চক্রান্ত নস্যাৎ হলো মুজাদ্দিদ সাহেবের ইমানী শক্তি, বলিষ্ঠ যুক্তি ও দুর্জয় সাধনার দ্বারা।

৪.

ইন্তেকাল

শেখ আহমদ সারহিন্দী (রঃ) ১০৩৪ হিজরী (১৬২৪ ইং) সনে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের কয়েক মাস পূর্বে তিনি প্রায়ই বলতেন,—"আমার বয়স ৬৩ বছর হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।" মুজাদ্দিদ সাহেব সারা জীবন নবীর আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। হয়ত তাঁর ধারণা ছিল,—তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত এই বিষয়টিকেও মহান আল্লাহ্ মহানবীর আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল রাখবেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)ও ৬৩ বছর বয়সেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর এই বাসনাও পূরণ করেন।

জীবনের শেষ শা'বান মাসে মুজাদ্দিদ সাহেব অনুভব করলেন যে, তাঁর জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পরকালের প্রস্তুতি নিতে হবে। দ্বীনি আন্দোলনের সব কিছু আপন পুত্রগণকে বুঝিয়ে দিলেন। এখন থেকে সব দায়িত্ব তাঁদের উপরই অর্পণ করলেন। আর স্বয়ং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহ্ স্মরণে মশগুল হলেন। নামাজের সময় ছাড়া নির্জন-প্রকোষ্ঠ থেকে তিনি কখনো বের হতেন না। এই সময় তাঁর নফল রোযা ও দান-খয়রাতের পরিমাণও বেড়ে যায়।

জিল-হজ্জ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুজাদ্দিদ সাহেব হঠাৎ রোগাক্রান্ত হন। রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। ১২ই মোহাররম বলেন, "আমার সময় শেষ। অচিরেই আমাকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।" জীবনের শেষ রাত তিনি যথা নিয়ম ঘুম থেকে ওঠেন, অজু করেন এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়েন। পরে খাদেমদেরকে বলেন, "তোমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আর নয়। আজ তোমাদের এই কষ্টের অবসান হবে।" তাঁর এই কথা সত্যে পরিণত হয়। সে দিনই তিনি আল্লাহ্‌র জিকর করতে করতে এই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'

মুজাদ্দিদ সাহেবের নামাযে জানাযার ইমামতি করেন, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র খাজা মুহাম্মদ সাঈদ (রঃ)। জন্মভূমি সারহিন্দ শহরে জ্যেষ্ঠ সন্তান খাজা মুহাম্মদ সাদেক (রঃ)-এর কবরের পাশেই মুজাদ্দিদ সাহেবকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ্ মুজাদ্দিদ সাহেবকে সাত পুত্র দান করেন। এর মধ্যে মুজাদ্দিদ জীবনকালেই চারজনের মৃত্যু হয়। বাকী তিনজন তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। পুত্রগণ হলেন,—

১. হযরত খাজা মুহাম্মদ সাদেক (রঃ)। তিনি মাত্র ২৫ বছর বেঁচে-ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই উন্নতিতে মুজাদ্দিদ সাহেব খুবই গর্বিত ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে মুজাদ্দিদ সাহেব অন্তরে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন।

২. হযরত খাজা মুহাম্মদ সাঈদ (রঃ)। তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের ইন্তেকালের পরেও জীবিত ছিলেন।

৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রঃ)। মুজাদ্দিদ সাহেবের আধ্যাত্মিক পন্থা ও দ্বীনি ভাবধারার প্রচার ও প্রসার তাঁর দ্বারাই সব চেয়ে বেশী হয়েছিল।

৪. হযরত খাজা শাহ মুহাম্মদ ইহাহ্ইয়া (রঃ)। মুজাদ্দিদ সাহেবের ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। তিনি ভাইদের নিকটই শিক্ষা লাভ করেন-এবং আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা গ্রহণ করেন।

৫, মুহাম্মদ আশরাফ। মাতৃক্রোড়েই মারা যান।

৬, মুহাম্মদ ফররুখ—১৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

৭, মুহাম্মদ ঈসা—৮ বছরের সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

হযরত খাজা মুহাম্মদ সাঈদ (রঃ)

তিনি ১০০৫ হিজরী সনে সারহিন্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ও শেখ তাহের লাহোরীর কাছে শিক্ষালাভ করেন। মাত্র সতের বছর বয়সের মধ্যেই কুরআন, হাদীস, তাফসীর ফিকাহ এবং এতদ্-সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন এবং এসব বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনে সমর্থ হন। এরপর তিনি অধ্যাপনার কাজ শুরু

করে দেন। ফিকাহ্ শাস্ত্রে এবং পার্থিব ব্যাপারে তিনি এত গভীর জ্ঞান রাখতেন যে, স্বয়ং মুজাদ্দিদ সাহেবও তাঁর থেকে এসব বিষয়ে পরামর্শ নিতেন। মুজাদ্দিদ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের তিনি একজন সাথী ছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব নিজ হাতে তাঁদের মন মানস গঠন করেছিলেন। সুতরাং সংস্কার আন্দোলনে তাঁদের পুর্ণ সহযোগিতাও পেয়েছিলেন।

হজ্জে গমন খাজা সাঈদ সাহেব—হজ্জে যেতে মনস্থ করেন। এজন্য সকল প্রস্তুতিও তিনি শেষ করেন। এসময় আওরঙ্গজেব ও দারাশিকোর-এর মধ্যে পিতৃসিংহাসন নিয়ে সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। আওরঙ্গজেব এসে খাজা সাহেবের দরবারে হাজির হলেন এবং যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য দোয়া চাইলেন। খাজা সাহেব বললেন,—শরীয়তের বিধি জারীর ওয়াদা যে করবে সেই জয়ী হবে। আওরঙ্গজেব ইসলামী শাসন কায়েমের অঙ্গীকার করলে খাজা সাহেব জানালেন—ইন্শাআল্লাহ্ আপনি সফল হবেন। এরপর খাজা সাহেব মক্কাশরীফ চলে গেলেন। হজ সমাপনের পর পুনরায় দেশে ফিরে আসেন। এসময় আওরঙ্গজেব সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন।

ওফাত : তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর আওরঙ্গজেব দ্বীনে পরামর্শ দান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বে দীক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁকে দিল্লী আসার অনুরোধ জানান। এতে তিনি প্রথমত নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিশেষে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বারবার অনুরোধে তিনি দিল্লী আসতে বাধ্য হন। দিল্লী এসে দ্বীনি কাজে বাদশাহকে পরামর্শ দান এবং শরীয়তের বিধি জারীতে তাঁর সহয়তা প্রদানে খাজা সাহেব আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দিল্লী আসার কিছুদিন পরেই আকস্মিকভাবে তিনি পীড়িত হয়ে পড়েন। বাঁচবার আসা নেই দেখে তিনি সারহিন্দ চলে যেতে চাইলেন এবং রওয়ানাও দিয়েছিলেন। কিন্তু ১০৭০ হিজরীর ২৭শে জমাদিউস্সানি পথিমধ্যে সাম্ভালকা' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃতদেহ সার-হিন্দ নেয়া হয় এবং সেখানে মুজাদ্দিদ সাহেবের পার্শ্বেই দাফন করা হয়।

খাজা মুহাম্মদ মা'সুম (রঃ)

খাজা মা'সুম সাহেব ১০০৭ হিজরীতে সারহিন্দ সংলগ্ন 'বসি' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি মুজাদ্দিদ সাহেব, বড়ো ভাই খাজা সাদেক এবং শেখ তাহের লাহোরীর কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তাঁর সর্বপ্রকার দ্বীনি শিক্ষা সমাপ্ত হয়ে যায়। মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁকে প্রায়ই বলতেন,—'বাবা, তোমার কাছ থেকে অতি বড়ো বড়ো কাজ নেয়ার আছে। শীঘ্রই বিদ্যাশিক্ষা করে নাও।' পিতার এই আদেশ তিনি রক্ষা করেছিলেন।

খাজা মা'সুম সাহেব মুজাদ্দিদ সাহেবের কাছেই আধ্যাত্মিকতার সবক নেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাতে চরম উন্নতি লাভ করেন। তিন ভাইদের মধ্যে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন এবং পিতার গদ্দীনশীন হন।

তিনি দ্বীনি এলেম শিক্ষাদানের জন্যও সুন্দর ব্যবস্থা করেন। হাজার হাজার ছাত্র এতে অংশ নিত। তিনি নিজেই অধ্যাপনা করতেন। কুরআনের তাফ্সীর ও হাদীস শরীফ শিক্ষাদানের প্রতিই তাঁর অধিক ঝোঁক ছিল। এছাড়া মুজাদ্দিদ সাহেবের পত্রাবলীও তিনি ছাত্রদের পড়াতেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানও তিনি করতেন। ঐতিহাসিকদের মতে মুজাদ্দিদ সাহেবের খলীফাবর্গের মধ্যে খাজা মাসুম সাহেবের দ্বারাই তাঁর ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিক প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটে। নারী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় নয় লক্ষ লোক তাঁর হাতে দীক্ষা নেয় এবং তওবা করে। তাঁর সাত হাজার খলীফা দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করতে থাকেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সুলতানের গভর্নর থাকাকালে খাজা সাহেবের দরবারে হাজির হতেন। যেখানেই জায়গা পেতেন, সেখানেই বসে যেতেন। খাজা সাহেবের ভীতি তাঁর উপর এত প্রবল ছিল যে, আওরঙ্গজেব তাঁর মুখোমুখি কোন কথা বলতে সাহস পেতেন না। যা-কিছু বলার কাগজে লিখে পেশ করতেন।

খাজা সাহেবের শিক্ষা

খাজা মাসুম মুজাদ্দিদ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র এবং গদ্দীনশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁর শিক্ষা মুজাদ্দিস সাহেবের শিক্ষারই অনুরূপ হবে —তা নিঃসন্দেহ। মুজাদ্দিদ সাহেবের দীর্ঘদিনের সাধনা ও সংগ্রামের ফলকে খাজা সাহেব তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তিনিও আবার অনুসারীদের কুরআন-সুন্নাহ অনু-শিক্ষা দিয়েছিলেন। শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুকরণ, রসুল (সঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ, বেদা'ত ও কুসংস্কার পরিহার এসবই মুজাদ্দিদ সাহেবের মুল লক্ষ্য ছিল। আর খাজা সাহেবও এসবের উওরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। মুজাদ্দিদ সহেবের ন্যায় তাঁর পত্রাবলীও অনুরূপ শিক্ষায় ভরপুর ছিল। এক পত্রে তিনি লিখছেন,—

"প্রিয় ভাই!

বিপত্নীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাক। ইয়াহ্ইয়া মায়াজরাজী (রঃ) বলেন,—তিন ব্যক্তির সংস্পর্শ পরিহার করে চলো—দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শনকারী আলেম, শরীয়তবিরোধী দরবেশ এবং মূর্খ সুফী। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা দানকারী পীরের আসনে আসীন হয়েছে,—অথচ রসুল (সঃ)-এর সুন্নাতের অনুসারী নয়—এবং শরীয়তের অলংকারে সুসজ্জিত নয়—তার থেকে দূরে অবস্থান করো। কখনো তার নিকটে যেও না। এমনকি যে শহরে সে বাস করে সেই শহরেও থেকো না। কেননা, কিছুদিন পর ক্রমে ক্রমে তার প্রতি মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। এমন ব্যক্তি নেতা হওয়ার উপযুক্ত নয়। সে আত্মগোপনকারী চোর, শয়তানের এজেন্ট। তার মধ্যে যত কেরামতীই দেখ না কেন, অস্বাভাবিক যত কিছুই তার থেকে ঘটুক না কেন, এবং দুনিয়ার সাথে যত সম্পর্কহীনই সে হোক না কেন,—অবশ্যই তার এবং তার সংশ্রব থেকে তত দূরে ভাগো মানুষ সিংহ দেখলে যতদূর ভাগে।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) বলেন, সকল পদ বন্ধ, শুধু একটি পথই খোলা। যে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করে এ পথটি তারই জন্য।

তিনি আরো বলেন, পবিত্র কুরআন যে মুখস্থ করেনি, রসূল (সঃ)-এর হাদীস শেখেনি—তার অনুসরণ করা যাবে না, কেননা, ইসলামের এই কারখানার ভিত্তি আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূল (সঃ)-এর সুন্নাহর উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আরও বলেছেন, —সেই নেতা, যিনি আল্লাহ্‌র প্রিয়, যাঁকে পথিকৃৎ বলা যায়—তিনি কিতাব ও সুন্নাহ্‌র অনুসারী। তাঁরাই প্রকৃত সুফী, শরীয়ত ও তরিকতের যথার্থ আলেম, নবীদের ওয়ারিশ, এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা, কাজ ও চরিত্রের অনুকরণকারী। আল্লাহ্ এসব ব্যক্তির কল্যাণকর দিকগুলো আমাদেরকেও যেন দান করেন।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী আরও বলেন, যে ব্যক্তি নবীর সুন্নতের প্রতি অবহেলা দেখায় এবং তা বর্জন করে, কখনো তাঁকে সত্যিকার সুফী মনে করো না। তার সংসার, ত্যাগ, নির্জনতা অবলম্বন, বৈরাগ্য সাধন এবং অস্বাভাবিক ক্রিয়াক্রমের অনুরাগী হয়ো না,—তার সাধনা তাওয়াক্‌কুল একত্ববাদের বাহ্যিক আচরণে ধোঁকা খেও না। কেননা, ইহুদী, খৃস্টান, যোগী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়ও এসব কাজ করে থাকে। ... ...

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক (রঃ) ইরশাদ করেছেন, মুস্তাহাব বিষয়ে অলসতাকারীর শাস্তি এই যে, সুন্নাত অনুযায়ী চলার তওফীক তার হবে না। আর সুন্নাত থেকে যে বঞ্চিত হয়, ফরয আদায় থেকে বঞ্চিত হওয়াই তার শাস্তি। আর ফরজ আদায়ে যে অলসতা করবে, নিসন্দেহে সে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে বঞ্চিত হবে। "পাপ কুফরকে অধিক বাড়িয়ে দেয়" - রসূল(সঃ)-এর একথা বলার যুক্তি এখানেই।

হজরত শেখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রঃ)-কে সমসাময়িক বাদশা বললেন, অমুক ব্যক্তি আকাশে উড়ে।

শেখ ঃ কাক এবং মশা-মাছিও আকাশে উড়ে থেকে।

সুলতান ঃ অমুক ব্যক্তি মুহূর্তের মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে পৌঁছে যায়।

শেখ ঃ শয়তান এক নিশ্বাসে পৃথিবীর পূর্ব সীমা থেকে পশ্চিম সীমায় পৌঁছে গিয়ে থাকে।

বস্তুত অনুরূপ জিনিসের কোনই মূল্য নেই। সত্যিকার পুরুষ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে মিলে-মিশে থাকে, হাট-বাজার ও ক্রয়-বিক্রয় করে, মানুষের জমায়েতে শরীক হয়, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতিপালন করে। আর এসব পার্থিব বিষয়ের সাথে জড়িত ও সংশ্লিষ্ট থেকেও ক্ষনিকের জন্যও খোদাকে ভুলে যায় না।"[১]

মুজাদ্দিদ সাহেব বাদশাহ ও আমীর-উমরাহদের চরিত্র সংশোধন করেছেন, তাঁদেরকে শরীয়তের অনুসারী বানিয়েছেন। আর খাজা মা'সুম সাহেব তাঁদেরকে সতিকার মুসলিম বানানোর প্রয়াস পেয়েছেন। স্বৈরতান্ত্রিক ও রাজতন্ত্র রাজা-বাদশাহদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হতো সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, সম্পদ আহরণ এবং প্রতাপ-প্রতিপত্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যই। কিন্তু খাজা সাহেব তাঁদের এই মনোভঙ্গি ও ভাব ধারার পরিবর্তন সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সত্যিকার জেহাদী মনোভাব ও সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা চালিয়েছেন এবং এতে তিনি সফলও হয়েছেন। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব (আলমগীর) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক বাদশাহ খাজা, সাহেবের প্রচেষ্টায় তাঁদের পূর্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে অমূল্য পরিবর্তন এসে যায়। যুদ্ধ সে সময়ও হয়েছে,—কিন্তু তা সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ ও ধন-রত্ন লুণ্ঠনের জন্য নয়,—বরং ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই।

সম্রাট শাহজাহান শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে বলখের যুদ্ধে পাঠান। আওরঙ্গজেবও রওয়ানা হয়ে যান। এসময় খাজা মাসুম সাহেব আওরঙ্গজেবকে একখানা প্রত্র লিখেন। পত্রে তিনি যেভাবে জিহাদের সত্যিকার রূপটি তুলে ধরেন, উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি ও সংগ্রামী চেতনা উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন,—তা প্রত্যেক মুসলমানেরই শিরা উপশিরায় রক্তের প্লাবন এনে দেয়। তিনি লিখছেন,—

"শুভ মুহূর্ত ও শুভ অবস্থায় এই ভয়াবহ ও প্রচণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন। এজন্য সুদৃঢ় বন্ধনে কোমর বেঁধেছেন—সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছেন। আগ্রহ উদ্দীপনা ও সদুদ্দেশ্য নিয়ে সুদীর্ঘ সুদূর সফরে

১. হালাতে মাশায়েখ নকশবন্দ পৃঃ ৩৪০-৪২

যাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে এর পরিনাম শুভ ও কল্যাণকর হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলছেন,—

'বেহেশ্‌তে এক শোটি শ্রেণী আছে। সর্বোচ্চ শ্রেণী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্য। এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীর দূরত্ব আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমপরিমাণ। (বোখারী শরীফ) মহানবী (সঃ) বলছেন—

আল্লাহ্‌র পথে এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত করা—মক্কা মোয়াজ্জমায় হাজরে আস্‌ওয়াদের (কৃষ্ণপাথর) পাশে শবে কদরে সারারাত জাগ্রত থাকার চেয়েও উত্তম। (বায়হাকী ও ইবনে হাব্বান)

যেহেতু মক্কা মোয়াজ্জমায় হেরেম শরীফে কদরের এক রাত্রি কাটানো দশ লাখ মাসের রাত্রি জাগরণের সমতুল্য। এজন্য আলেমগণ এই যুক্তি বের করেছেন যে, জিহাদের সময় এক ঘন্টা অতিবাহিত করা দশ লাখ মাসের রাত্রি জাগরণের চাইতেও উত্তম।

হযরত আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে,—"যে ব্যক্তি জিহাদের সময় রাত্রিকালে পাহারায় রত থাকে—তার প্রহরাধীনে যত লোক রোযা বা নামায আদায় করে, তাদের সবার সমপরিমাণ পুণ্য সে একাই পাবে। (তিবরানী)

শ্রদ্ধেয় আলেমগণ এই হাদীস থেকে প্রমাণ করছেন যে, কোন শাসন কর্তার শাসিত এলাকার মধ্যে যত লোক শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর ইবাদত করছে,—তাদের সবার সমপরিমাণ পুণ্য ও সওয়াব ওই ন্যায়বান শাসনকর্তা পাবেন।

আফ্‌সোস! এই অধম ও অক্ষম ব্যহ্যত বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতার কারণে আল্লাহর পথে জিহাদের এই অসীম পুণ্য থেকে বঞ্চিত! হায়! যদি আমি এই মুজাহিদদের সাথে থাকতাম,—তাহ'লে আমিও মহা সুফল লাভ করতাম!

যা হোক! আমি আপনাদের জন্য দোয়া করছি—এ হিসেবে এই অধমকেও আপন সাথী ও সাহায্যকারী জানবেন।

আমার ন্যায় নির্জন প্রকোষ্ঠে আত্ম-গোপনকারী আধমরা যদি বহু

বছরও সাধনা করে, চিল্লা দেয়,—তা'হলেও জিহাদের সওয়াবের নিকটেও পৌঁছুতে পারবে না।

জিহাদের সময় যে ইবাদত বন্দেগী করা হয়,—নির্জন প্রকোষ্ঠের ইবাদত বন্দেগীর চাইতে তার স্থান বহুগুণ উর্ধ্বে। জিহাদের সময়কার জিক্‌র ও তাসবীহের সওয়াবই আলাদা, নামাজের মর্যাদা ভিন্ন দান-খয়রাতের মান বহু উচ্চ এবং আহত ও পীড়িতদের ফজিলত অনন্য। রসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন,—

'ওই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান, জিহাদের সময় যে আল্লাহকেও বেশী স্মরণ করে। সে প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে সত্তর হাজার পুণ্য লাভ করবে। প্রত্যেক নেকীর জন্য দশগুণ সওয়াব পাবে। আর আল্লাহ্‌র কাছে তো এর চাইতেও অধিক পুণ্য লাভের সম্ভাবনা আছেই। (তিব্‌রানী) আল্লাহ্‌র নবী আরো বলছেন,—'আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায পড়ার সওয়াব দশ হাজার গুণ, মসজিদে হারামে এক লাখ গুণ।' আর জিহাদের ময়দানে বিশ লক্ষ গুণ।' (আবু শায়খ ও ইবনে হাব্বান)

নবী আরো জানাচ্ছেন,—'জিহাদের ময়দানের নামায পাঁচ শো নামাযের সমান এবং এক দীনার বা দিরহাম দান সাত শো দীনার বা দিরহাম দানের সমতুল্য।'

তিনি আরও জানালেন,—'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীকে সাহায্য করে তার অবর্তমানে তার পরিবার পরিজনের প্রতি লক্ষ্য রাখে—সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র ছায়ায় আশ্রয় পাবে, অথচ সেদিন আর কোথায়ও কোন ছায়া থাকবে না।' (আহমদ, বায়হাকী) ....এই খেদমত ও সংগ্রাম—যা এখন আপনার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু—তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। ——আল্লাহ্‌র রসুল (সঃ) বলেছেন,—'তোমার স্বীয় নফ্‌স ও প্রবৃত্তির সাথে শত্রুতা বজায় রেখো। কেননা, সে তোমাদের শত্রুতা সাধনের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে রয়েছে।'

আন্তরিক বিশ্বাসপোষণ এবং মুখে স্বীকার করা সত্ত্বেও মানুষের কুপ্রবৃত্তি কুফর ও পাপের উপর অটল। আসমানী বিধি-বিধান ও খোদায়ী নির্দেশের প্রতি সে আগ্রহী ও আকৃষ্ট নয়। সে চায়, প্রত্যেকেই

অত গর্ব ও অহংকার করাই তার স্বভাব। "আমি তোমাদের রব"—সদা এই ধ্বনিই তার প্রকৃতি থেকে উচ্চারিত হয়। এজন্য তার শক্রতা পসন্দনীয় এবং আল্লাহ্র নিকট প্রশংসনীয়। আর শরীয়ত অনুসরণের মধ্যে দিয়ে কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ। দুনিয়ার শত্রুদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই জিহাদের সুযোগ ঘটে। কিন্তু এই আভ্যন্তরীণ দুশমনের সাথে সবসময় প্রতি মুহূর্তেই জিহাদ চলতে থাকে।

আল্লাহ্র কিছু সংখ্যক বান্দা এমন পূর্ণস্তরে পৌঁছে যান যে, তাঁদের ওই বিশ্বাসঘাতক নফ্স, বিশ্বাসঘাতকতায় ও কুকর্মসাধনে অক্ষম হয়ে পড়ে। নফ্স তখন খোদায়ী নির্দেশের অনুগত হয়ে যায়। কেননা, তখন আর তার বিরোধিতার সুযোগ থাকে না। কাজেই সে খোদায়ী বিধানের উপর রাজী হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার নাম হয় 'নফ্সে মুতইমান্না" (সুবোধ ও সুশীল প্রবৃত্তি) তখন আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণীয় ও পসন্দনীয় মর্যাদা লাভ করে। পূর্ণ ঈমান ও প্রকৃত ইসলাম এই স্তরেই হাসিল হয়। এই ঈমান পতন ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে সুরক্ষিত হয়ে যায়। আল্লাহ্র নবী বলেছেন—'হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে এমন ঈমানই চাই,—যার পরে কুফর না হয়।'

এই পূর্ণ ঈমানের আগে যেসব নামায, রোজা জাকাত হজ্ব ও জিহাদ অনুষ্ঠিত হয়—তা আমলের আকৃতি মাত্র। প্রকৃত আমল এই পূর্ণ ঈমান। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত 'নফ্সে আম্মারা' আপন শত্রুতার উপর অনড় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত আমল বাস্তবায়িত হতে পারে না।

প্রকৃত আমল এবং তার বাহ্যিক আকৃতি উভয়েই পবিত্র শরীয়তের পরিসীমার অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাত ও তাঁর আভ্যন্তরীণ আলোক থেকে গৃহীত। একটি শরিয়তের আকৃতি, অপরটি প্রকৃত শরীয়ত। এই মহারত্ন যার এখনো হাসিল হয়নি—সেই রত্নের সন্ধানে তৎপর থাকা। যেখানেই এর খোঁজ পাওয়া যাবে, সেদিকেই দৌড়াবে এবং তা হাসিলের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালাবে।[১]

---

১. মাকতুবাতে খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রাঃ), প্রথম খণ্ড, পত্র নং ৬৪

এই পত্র এবং এরূপ অন্যান্য পত্রাবলী সম্রাট আওরঙ্গজেবের উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছিল, ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর ব্যক্তি, সামষ্টিক ও রাজনৈতিক জীবনের গতিধারা পর্যালোচনা করলেই একথার সত্যতা পাওয়া যাবে। তাঁর এই পূত পবিত্র চরিত্র, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ইসলামী অনুশাসনের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও তা অনুসরণ, বিশেষত বিশাল সাম্রাজ্যের বাদশাহ হয়েও ফকিরের ন্যায় চালচলন,—এসবের কারণেই তিনি 'আলমগীর জিন্দাপীর' নামে খ্যাত হয়েছেন।

ওফাত ঃ খাজা মুহাম্মদ মা'সুম সাহেব বুজর্গ ভাই খাজা মুহাম্মদ সাঈদের সাথেই মক্কায় হজ্জে গিয়েছিলেন। হজ্জ ক্রিয়া সমাপনের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বীয় দ্বীনি দায়িত্বের আঞ্জাম দিতে থাকেন। পরিশেষে একদিন বার্ধক্য এসে যায়। তিনিও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। চিকিৎসা চলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। একদিন সবাইকে ডেকে তিনি নসীহত করেন,—কুরআন শরীফ, হাদীস, ইজ্‌মা এবং মুজতাহেদীনের রায় অনুযায়ী যেন সবাই চলেন। শরয়ীতবিরোধী সূফীদেরকে কখনো কেউ যেন না মানেন। এরপর সবার কাছে মাফ চেয়ে নেন। হিজরী ১০৭৯ সনের ৯ই রবিউল আউয়াল ৭২ বছর বয়সে সূরায়ে ইয়াসীন পড়তে পড়তে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

হজরত শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (রঃ)

শাহ্ ইয়াহ্ইয়া সাহেব হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের কনিষ্ঠ সন্তান। হিজরী ১০২৪ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক বিশিষ্ট পীর শাহ্ সিকান্দর কাদেরী সাহেব তাঁকে 'শাহ' খেতাব দেন।

শাহ্ ইয়াহ্ইয়া সাহেব প্রখর মেধাসম্পন্ন ছিলেন। মাত্র ন' বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হেফাজ করে ফেলেন। এই সময় মুজাদ্দিদ সাহেবের ইন্তেকাল হয়। শাহ সাহেব বড়ো ভাইদের কাছেই লেখাপড়া শেখেন। বিশ বছর বয়সেই তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়। শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ভাইদের নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

খাজা মা'সুম সাহেবের সাথে তাঁর বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। সম্রাট বহু গ্রাম ও জমিজমা তাঁকে নজরানা স্বরূপ দেন।

শাহ ইয়াহইয়া সাহেব দু'বার হজক্রিয়া সমাপন করেন। হিজরী ১০৯২ সনে ৭২ বছর বয়সে তিনি অস্থায়ী দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে যান। ইন্না···রাজেউন।

পুত্রগণ ছাড়াও মুজাদ্দিদ সাহেবের শত শত খলীফা দেশের সর্বত্র—দ্বীনি দায়িত্ব পালন করেন। এঁদের সবাই তৎকালের সুযোগ আলেম, নিষ্ঠাবান পীর ও কুরআন-সুন্নাহর সত্যিকার অনুসারী ছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেবের হাতে গড়া মানুষ ছিলেন তারা। সমসাময়িক কালে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত একদল তথাকথিত পীর-ফকির ও স্বার্থপর আলেমের কুশিক্ষার প্রভাবে মুসলিম সমাজে যে সকল বিদা'ত, কু-সংস্কার ও অনাচার অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল—তাদেরই হাতে এসবের মুলোৎপাটন ঘটে।

উপসংহার

বস্তুত মুজাদ্দিদ সাহেবের এই আন্দোলন ছিল একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন। তাই এটা শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সম্প্রসারণ ঘটেছিল সারা ভারত ও গোটা মধ্যপ্রাচ্য ব্যাপী। এসময়ে গোটা

বিশ্ব-মুসলিমের জীবনে দ্রুত নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন দেখা দিয়েছিল। ভাঙন ধরেছিল তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে। সেখানে দেখা যেত না কুরআন-সুন্নাহ্ অনুসরণের কোন প্রয়াস। বরং সাক্ষাৎ মিলত ইসলামের ছদ্মাবরণে অগ্নিপূজক ও সূর্য উপাসক ইরানী সভ্যতার, ভারতীয় পৌত্তলিকদের কঠোর অদৃষ্টবাদ ও অদ্বৈতবাদের, যোগ-সাধনা ও তান্ত্রিক কদাচারের। রাজা-বাদশাহ আমীর-উমরাহ ও পাত্র-মিত্র সবাই ছিলেন বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত, ইসলাম দ্রোহিতায় এসব দেখে মুসলমানদের ভয়াবহ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় মুজাদ্দিদ সাহেবের অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছিল। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি—কিংবা নিরাশ হয়ে যাননি। বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি বিরাট ও প্রতিকূল সংগ্রাম ক্ষেত্রে। অবতীর্ণ হয়েছিলেন জিহাদের ময়দানে। উড্ডীন করেছিলেন বিদ্রোহী। মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর অনুপম পাণ্ডিত্য, অসাধারণ প্রতিভা ঐকান্তিক নিষ্ঠা বিপুল কর্মশক্তি, দুর্দমনীয় সাহস এবং দুর্লভ আন্তরিকতা এবং সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্যে এই কঠোর সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। আর তাঁর এক বিশাল মুজাদ্দিদ বাহিনী এই সংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের পতাকা বয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরা সারা মুসলিম ভারত, ইরান-ইরাক, আরব ও আফগানিস্তানে। দ্বীনি আন্দোলনের এই মহাপ্লাবন আঘাত হেনেছিল মুসলিম জাহানের প্রতি কোণে কোণে। তাই তো শেখ আহমদ সারহিন্দী সাহেব মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ।

IFB—84-85—P/2433—3250—30. 10. 1984